বাংলার ইতিহাস-সাধনা

এই লেখকের :

ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ

ধর্মবিজয়ী অশোক

ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত

India's National Anthem

ধম্মপদ-পরিচয়

বাংলার ইতিহাস-সাধনা

প্রবোধচন্দ্র সেন

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মাতা ও পিতার শ্রীচরণকমলে

॥ ১৫ কার্তিক ১৩৫৯ ॥

স্বীকৃতি

এই গ্রন্থের উপাদানসংগ্রহে প্রেসিডেন্‌সি কলেজে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীমান্ দেবীপদ ভট্টাচার্য এম-এ এবং কৃষ্ণনগর কলেজে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীমান্ ভবতোষ দত্ত এম-এ, এই দুজনের কাছেই প্রচুর এবং অকুণ্ঠ সহায়তা পেয়েছি, কোনো কোনো বিষয়ে তাঁদের পরামর্শও গ্রহণ করেছি। দুই জনই আমার পরম স্নেহের পাত্র। কৃতজ্ঞতার ব্যবধান সৃষ্টি করে তাঁদের লজ্জিত ও আমাদের সম্পর্ককে খণ্ডিত করতে চাইনে। আমার প্রাক্তন ছাত্র স্নেহভাজন শ্রীমান্ সন্তোষকুমার দে সম্বন্ধেও উক্ত মন্তব্য প্রয়োক্তব্য। এই গ্রন্থপ্রকাশ ব্যাপারে তিনিও আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন।

এই গ্রন্থের খসড়াটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল পূর্বাশা পত্রিকায়। তার মূলে ছিল উক্ত পত্রিকার সম্পাদক স্নেহভাজন বন্ধু শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্যের উৎসাহ। আর, গ্রন্থের বর্তমান প্রকাশ হল বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত বন্ধুবর শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস এম-এ'র অকৃত্রিম আগ্রহ ও অনুরাগের ফলে। সর্বশেষে উল্লেখ করছি হিতৈষী সুহৃদ্ শ্রীপুলিনবিহারী সেনের নাম। তাঁর নিরন্তর হিতৈষণার প্রেরণাই হচ্ছে এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের মুখ্যতম উৎস। এঁদের সকলকেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

প্রবোধচন্দ্র সেন

অধ্যায়সূচি

দেশনা	৫
প্রসঙ্গ	৯
অবতারণা	১
ভারতবর্ষের ইতিহাস নাই কেন	৩
বাংলার ইতিহাস নাই কেন	৮
বাংলার জাগরণ	১৩
উদ্‌যোগ-পর্ব	১৭
ইতিহাসের দ্বারমোচন	২৩
বঙ্কিমচন্দ্র	২৭
রবীন্দ্রনাথ	৩৩
ইতিহাস-সাধনার ধারা	৪১
বাংলার ইতিহাস-চর্চার শেষরূপ	১০৭
বাংলার ইতিহাস-উদ্ধারে বাঙালির আত্মনিষ্ঠা	১৫৩
শিক্ষালয়ে বাংলার ইতিহাস	১৫৯
লোকশিক্ষায় বাংলার ইতিহাস	১৮২
পরিশেষ	১৮৬
অনুষঙ্গ	১৯১
সংযোজন	২০১
নির্দেশিকা	২০৫

স্বদেশী প্রণালীর শিক্ষার প্রধান ভিত্তি স্বার্থত্যাগপর অধ্যয়ন-অধ্যাপনারত নিষ্ঠাবান্ গুরু এবং তাঁহার প্রধান অবলম্বন স্বদেশের একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস।

যে-সকল দেশ ভাগ্যবান্, তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়; বালককালে ইতিহাসই দেশের সহিত তাহাদের পরিচয়-সাধন করাইয়া দেয়। আমাদের ঠিক তাহার উলটা। দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

বাংলা দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, লোকবিবরণ প্রভৃতি যাহা-কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য, সমস্তই আমাদের বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়। দেশের এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার ঔৎসুক্য আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তাহা না হইবার কারণ নিজের দেশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং পরের দেশের জিনিস আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। সেই জন্য যদিও আমরা স্বদেশে বাস করিতেছি, তথাপি স্বদেশ আমাদের জ্ঞানের কাছে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া আছে।

জ্ঞানশিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যাহা পরিচিত

তাহাকে সম্পূর্ণরূপে যথার্থভাবে আয়ত্ত করিতে শিখিলে তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে। বাংলা দেশ আমাদের নিকটতম—ইহারই ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতির প্রতি যদি ছাত্রেরা লক্ষ্য রাখে তবে প্রত্যক্ষ বস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হইয়া উঠিবে এবং নিজের চারিদিক্‌কে, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানিবার অভ্যাস হইলে অন্য সমস্ত জানিবার যথার্থ ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে।

—রবীন্দ্রনাথ

প্রসঙ্গ

ইতিহাস-জিজ্ঞাসা শিক্ষিত মনের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। ব্যক্তিমন ও জাতীয় মন, উভয়ের পক্ষেই একথা সত্য। আর একথাও সত্য যে, ইতিহাসচেতনাহীন আত্মবিস্মৃত বাঙালির কোনো ইতিহাস ছিল না কিছুকাল পূর্বেও। হিন্দু বাঙালি ও মুসলমান বাঙালি উভয়ের পক্ষেই এটা পরম লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয়। ইতিহাস-সচেতন ইংরেজ জাতি বাংলার রাজপদে কার্যতঃ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৫৭ সালে। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাদের তীব্র ইতিহাস-জিজ্ঞাসা বাংলার ইতিবৃত্ত রচনার পথ নির্মাণে নিয়োজিত হয় এবং প্রায় এক শতাব্দীকাল সে দায়িত্বের ভার তারাই বহন করে। ইতিমধ্যে ইংরেজি শিক্ষার গুণে তাদের মন থেকে বাঙালির মনে ইতিহাসচেতনা ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত হতে থাকে। এই চেতনাসঞ্চারের কৃতিত্ব শুধু ইংরেজি শিক্ষা নয়, ডিরোজিও-প্রমুখ মনস্বী শিক্ষকদেরও প্রাপ্য। যা হক, এই চেতনা আমাদের মনে সক্রিয় জিজ্ঞাসায় পরিণত হতেও দীর্ঘকাল লেগেছিল। সে জিজ্ঞাসাকে সাধনার পথে সবচেয়ে বড় প্রেরণা দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ। তারই ফলে বাংলার অনুপলব্ধ ইতিহাস আজ বাঙালির কাছে পূর্ণাঙ্গরূপে না হক অনেকটা সুস্পষ্ট মূর্তি নিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে। বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙালি-মনের এই চেতনা, জিজ্ঞাসা ও সাধনার

ক্রমপরিণতি ও বিকাশের ধারা অনুসরণ করাই এই গ্রন্থ রচনার অভিপ্রায়। যদি এই পুস্তকখানি পাঠকের মনে স্বদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে বোধ ও জিজ্ঞাসা সঞ্চার করতে তথা সে ইতিহাস সংগঠনের সাধনায় প্রণোদিত করতে কিছুমাত্র সহায়তা করে, তা হলেই লেখকের প্রথম অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

আজ বাংলার এই চরম দুর্দিনে আত্মরক্ষার উপায় উদ্‌ভাবন করতে হলে বাঙালিকে স্বদেশের ইতিহাসের কাছেই শিক্ষা নিতে হবে। ইতিহাসের জ্ঞানই জাতীয় জীবনসংগ্রামে জয়লাভের একমাত্র ও অমোঘ আয়ুধ। যে নির্দয়মূর্তি সর্বনাশ আজ বাংলাদেশের দ্বারে সমুপস্থিত হয়ে কালের দুন্দুভিতে প্রলয়ধ্বনি জাগিয়ে তুলেছে, তাকে প্রতিরোধ করতে হলে ইতিহাসের দৃঢ়ভূমিতে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের শিক্ষাকেই প্রয়োগ করতে হবে অবিচলিতচিত্তে। স্বদেশের ইতিহাসশিক্ষাকে সমগ্র জাতির মনে ব্যাপক ও অব্যর্থভাবে সঞ্চার করা চাই। তার প্রকৃষ্টতম উপায় দেশের শিক্ষালয়গুলির যোগে বালকবালিকাদের মনে স্বদেশের ইতিহাসবোধ জাগানো, শিক্ষার প্রতিস্তরেই বাংলার ইতিহাসকে ক্রমোন্নত-পদ্ধতিতে অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়রূপে প্রবর্তিত করা,—যেন বুদ্ধির পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মনে বাংলার সংস্কৃতি ও সমস্যার স্বরূপ এবং তার বিকাশ ও প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান ও উদ্‌ভাবনা স্বতঃই স্ফুরিত হতে থাকে। অতীতের দিকে চোখ ফেরালেই দেখি অন্ততঃ ১৮৪০ সাল থেকে উনবিংশ শতকের শেষ, এমন কি তার পরেও কিছুকাল পর্যন্ত আমাদের

বিত্থালয়গুলিতে বাংলার ইতিহাস পঠন-পাঠনের ধারা অব্যাহত-গতিতেই চলেছিল। অথচ তখন বাংলার ইতিহাসের পূর্ণরূপও দেখা দেয়নি, বাঙালি জাতিও কোনো সংকটের সম্মুখীন হয়নি। আজ বাংলার ইতিহাসের সর্বাবয়ব সম্পূর্ণ না হলেও তার পূর্ণমূর্তির আভাস দেখা যাচ্ছে, আর পরম মহাসংকটও বাঙালি জাতিকে চারদিক্ থেকে ঘিরে ধরেছে। কিন্তু এখনও আমরা ইতিহাসের শিক্ষা নেবার প্রয়োজন বোধ করছি না, আমাদের শিক্ষার কোনো স্তরেই বাংলার ইতিহাস শিক্ষণীয় বিষয় বলে স্বীকৃত নয়। বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে লেশমাত্র জ্ঞান না নিয়েও ইতিহাস-শিক্ষারই চরম সীমা অনায়াসেই উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া যায়। এটা শুধু দুঃখ এবং লজ্জার বিষয় নয়, বিপদেরও হেতু। সবিনয়ে আমাদের শিক্ষানায়কদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি। বর্তমান গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে উনবিংশ শতকে আমাদের বিত্থালয়গুলিতে বাংলার ইতিহাস অধ্যাপনার ব্যবস্থা ও পাঠ্য-পুস্তকাদির বিষয়ে আলোচনা করেছি। যদি এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি আমাদের শিক্ষাবিধায়কদের মনে স্কুলে ও কলেজে বাংলার ইতিহাস শিক্ষার পুনঃপ্রবর্তনে কিছুমাত্র প্রণোদনা সঞ্চার করতে পারে, তবে লেখকের দ্বিতীয় মুখ্য অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

মোটামুটি বলতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকে আমাদের প্রায় অলক্ষ্যেই বাংলায় এমন একটি ইতিহাস-সাহিত্য গড়ে উঠেছে, কাব্য- ও কথা-সাহিত্যের তুলনায় খাটো হলেও পরিমাণে এবং মূল্যবত্তায় যা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। বাংলা

সাহিত্যের এই ইতিহাস-বিভাগটির প্রতি সাহিত্যবিচারকদের মনোযোগ যথোচিতভাবে নিবদ্ধ হয়নি। একথা গ্রন্থের 'অবতারণা' অংশে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। বাংলার ইতিহাস-সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। সংক্ষেপে ওই সাহিত্যের বহিরবয়বের একটা মোটামুটি পরিচয় দেওয়াই অভিপ্রেত। যদি এর দ্বারা বাংলার ইতিহাস-সাহিত্যের প্রতি পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং সে সাহিত্যের স্বরূপ ও গতিপ্রকৃতির পূর্ণাঙ্গ বিচারে কিছুমাত্র প্রবর্তনা ঘটে, তা হলে এই গ্রন্থ রচনার তৃতীয় অভিপ্রায় পূর্ণ হবে।

এই গ্রন্থের প্রাথমিক রূপটি 'বাংলার পুরাবৃত্তচর্চা' নামে পূর্বাশা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল (১৩৫৮, বৈশাখ-আশ্বিন)। অতঃপর সেটিকে বহুল পরিমাণে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করে নূতন রূপে ও নূতন নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা গেল। যে তিন অভিপ্রায় নিয়ে এই গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হল, তা পূরণের পক্ষে আমার প্রয়াস কতখানি সফল হয়েছে, সে বিচারের ভার পাঠকের উপরে ন্যস্ত করেই এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করছি।

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
১৫ কার্তিক ১৩৫৯

প্রবোধচন্দ্র সেন

জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ ভারত-রতনে।

—মধুসূদন

অবতারণা

ইতিহাসেরও ইতিহাস থাকতে পারে। তার বহু নিদর্শন আছে ইউরোপীয় সাহিত্যে। দীর্ঘকালব্যাপী চর্চার ফলে যখন কোনো দেশের ইতিহাস-সাহিত্য বিপুল হয়ে ওঠে, তখন তারও ইতিহাস রচনার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজনেই ইউরোপের কোনো কোনো দেশে ঐতিহাসিক চিন্তাধারার ও ইতিহাস রচনার রীতিপদ্ধতি বিবর্তনের ইতিহাস লেখার প্রথা দেখা দিয়েছে। সেখানে ইতিহাস রচনার আদর্শ নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে; আর ঐতিহাসিকদের জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছে তার পরিমাণও কম নয়। আমাদের দেশে দীর্ঘকালব্যাপী কাব্যসাহিত্য আছে; তাই তার ইতিহাসও রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সাহিত্য-সাধকদের চরিতমালাও রচিত হচ্ছে দেশের অন্তরে স্বাভাবিক প্রবর্তনার বশেই। বাংলার ইতিহাস-সাহিত্য অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। তাই আমাদের পুরাবৃত্ত-সাহিত্যের ইতিহাসও হয়নি এবং পুরাবৃত্তসাধকদের চরিতমালা রচনার কথা কল্পনায়ও স্থান পায়নি। অবশ্য সাহিত্যসাধকচরিতমালায় ঐতিহাসিকদেরও স্থান দেওয়া হয়েছে। বাংলার ঐতিহাসিকদের স্বতন্ত্র পরিচয় দেবার সময় এখনও হয়নি।

কিন্তু দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর ইদানীং বাংলার সরকার-প্রদত্ত প্রথম রবীন্দ্রস্মৃতি-পুরস্কার জুটল বাংলা দেশের একখানি ইতিহাসগ্রন্থের ভাগ্যে। এ ঘটনা তাৎপর্যহীন নয়। এর তাৎপর্যের দিকে মনোযোগ ফেরালে দেখা যাবে বিগত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে আমাদের প্রায় অলক্ষ্যেই বাংলা দেশে এমন একটি ইতিহাস-সাহিত্য গড়ে উঠেছে যার পরিমাণ ও ঋদ্ধি উপেক্ষণীয় নয়। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ হচ্ছে বাংলার নব্য কাব্য ও কথাসাহিত্যের উদ্‌বোধনের যুগ, আর বিংশ শতকের প্রথমার্ধ হল উক্ত কাব্য ও কথাসাহিত্যের পরিণতি এবং ইতিহাস-সাহিত্যের উন্মেষের যুগ। বাংলা কথাসাহিত্যের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলার ইতিহাস-রচনার প্রথম প্রেরণাদাতা। এই প্রেরণা অধিকতর প্রবলতা লাভ করে ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে। অতঃপর ১৯০৫ সালে বাংলায় যে দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস দেখা দেয়, তারই প্রবর্তনায় দেশের ইতিহাস উদ্ধার ও রচনা করবার আগ্রহ বহু ধারায় প্রবাহিত হয়। ওই দেশপ্রীতির বন্যাসঞ্চিত পলিমাটির উপরেই বিগত চার পাঁচ দশক ধরে কিছু কিছু করে ইতিহাসের ফসল ফলছে। বাংলার সাহিত্যভাণ্ডারে এই সময়ের মধ্যে এই নূতন ফসল কতটা সঞ্চিত হয়েছে, তার একটু হিসাব নেবার এখন সময় হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। এই হিসাব নেবার প্রয়াসেই বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা।

বাংলায় এই জাতীয় আলোচনার ক্ষেত্রে এটিই বোধ করি

প্রথম। ফলে এই রচনায় ত্রুটিবিচ্যুতি বা অপূর্ণতা থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। আশা করি প্রথম প্রয়াসের ত্রুটি বা অপূর্ণতা অমার্জনীয় বলে গণ্য হবে না। এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে, সমগ্রভাবে বাংলা দেশের ইতিহাসের কথাই এই নিবন্ধের বিষয়। ভারতবর্ষ, বঙ্গেতর কোনো প্রদেশ, বা বাংলা দেশেরই কোনো ভৌগোলিক অঞ্চল বা সম্প্রদায় প্রভৃতির ইতিহাস এই আলোচনার বিষয়ীভূত বলে গণ্য হয়নি। তাই রজনীকান্ত গুপ্তের সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস (১৮৭৬), কৈলাসচন্দ্র সিংহের রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস (১৮৭৬, দ্বিতীয় সং ১৮৯৬), রমেশচন্দ্র দত্তের **History of Civilisation in Ancient India** (১৮৮৯-৯০), শিবনাথ শাস্ত্রীর **History of the Brahmo Samaj** (১৯১১), সতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুলনার ইতিহাস (১৯১৪) প্রভৃতি বহু মূল্যবান্ গ্রন্থই এই আলোচনায় স্থান পায়নি। এই আলোচনার স্বীকৃত পরিধির মধ্যেও যদি কোনো গ্রন্থ অনুক্ত হয়ে থাকে তবে তার কারণ লেখকের অনবধানতা বা অজ্ঞতা, ইচ্ছাকৃত অবহেলা নয়।

১

ভারতবর্ষের ইতিহাস নাই কেন ?

"প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক বিষয়ে অসামান্যতা ছিল সন্দেহ নাই। সাধারণ মানবপ্রকৃতি হইতে ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি অনেক বিষয়ে স্বতন্ত্র। সেই অসামান্যতার একটি লক্ষণ এই যে,

সকল সভ্যদেশই আপন সাহিত্যে ইতিহাস ও জীবনী আগ্রহের সহিত সঞ্চয় করিয়া থাকে, ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে তাহার চিহ্ন দেখা যায় না; যদিবা ভারতসাহিত্যে ইতিহাস থাকে, তাহার মধ্যে আগ্রহ নাই।"

—প্রাচীন সাহিত্য, কাদম্বরীচিত্র

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি একটি অবিসংবাদিত সত্য। ভারতীয় সাহিত্যে ইতিহাসের অভাব দেশী ও বিদেশী সব মনস্বীদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ম্যাকডোনেল তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে (১৯০০) বলেছেন,—

History is the one weak spot in Indian literature. It is, in fact, non-existent. The total lack of the historical sense is so characteristic, that the whole course of Sanskrit literature is darkened by the shadow of this defect.

ভারতীয় মনে ঐতিহাসিক আগ্রহের এই যে অভাব, বিভিন্ন ঐতিহাসিক তার বিভিন্ন কারণ নির্ণয় করেছেন। ম্যাকডোনেল সাহেবের মতে তার কারণ দুটি।—

In the first place, early India wrote no history because it never made any, secondly, the Brahmans, whose task it would naturally have been to record great deeds, had early embraced the doctrine that all action and existence are a positive evil, and could therefore have felt but little inclination to chronicle historical events.

প্রাচীন ভারতে ঐতিহাসিক চেতনার অভাব কতখানি এবং

উক্ত দুটি কারণই সে অভাব ব্যাখ্যার পক্ষে যথেষ্ট কি না, এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি।[১] এস্থলে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ম্যাকডোনেল সাহেবের অভিমতকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা যায় না। ম্যাকডোনেল-কথিত দ্বিতীয় কারণটি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত এস্থলে উদ্ধৃতিযোগ্য।—

ভারতবর্ষীয়দিগের যে ইতিহাস নাই, তাহার বিশেষ কারণ আছে। কতকটা ভারতবর্ষীয় জড়প্রকৃতির বলে প্রপীড়িত হইয়া, কতকটা আদৌ দস্যুজাতীয়দিগের ভয়ে ভীত হইয়া ভারতবর্ষীয়েরা ঘোরতর দেবভক্ত। বিপদে পড়িলেই দেবতার প্রতি ভয় বা ভক্তি জন্মে। যে কারণেই হউক, জগতের যাবতীয় কর্ম দৈবানুকম্পায় সাধিত হয়, ইহা তাঁহাদিগের বিশ্বাস। ইহলোকের যাবতীয় অমঙ্গল দেবতার অপ্রসন্নতায় ঘটে, ইহাও তাঁহাদিগের বিশ্বাস। এজন্য শুভের নাম 'দৈব', অশুভের নাম 'দুর্দৈব'। এরূপ মানসিক গতির ফল এই যে, ভারতবর্ষীয়েরা অত্যন্ত বিনীত; সাংসারিক ঘটনাবলীর কর্তা আপনাদিগকে মনে করেন না; দেবতাই সর্বত্র সাক্ষাৎ কর্তা বিবেচনা করেন। এজন্য তাঁহারা দেবতাদিগেরই ইতিহাস কীর্তনে প্রবৃত্ত; পুরাণেতিহাসে কেবল দেবকীর্তিই বিবৃত করিয়াছেন। যেখানে মনুষ্যকীর্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে সে মনুষ্যগণ হয় দেবতার আংশিক অবতার, নয় দেবানুগৃহীত; সেখানে দৈবের সংকীর্তনই উদ্দেশ্য। মনুষ্য কেহ নহে, মনুষ্য কোন কার্যেরই কর্তা নহে, অতএব মনুষ্যের

১ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৭ শ্রাবণ এবং শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৪৭।

প্রকৃত গুণকীর্তনে প্রয়োজন নাই। এ বিনীত মানসিক ভাব ও দেবভক্তি অস্মজ্জাতির ইতিহাস না থাকার কারণ। ইউরোপীয়েরা অত্যন্ত গর্বিত; তাঁহারা মনে করেন, আমরা যাহা করিতেছি, ইহা আমাদিগের কীর্তি, অতএব তাহা লিখিয়া রাখা যাউক। এইজন্য গর্বিত জাতির ইতিহাসের বাহুল্য; এইজন্য আমাদের ইতিহাস নাই।

অহংকার অনেক স্থলে মনুষ্যের উপকারী; এখানেও তাই। জাতীয় গর্বের কারণ লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি বা উন্নতি; ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি মূল। ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী।

—বাঙ্গালার ইতিহাস, বঙ্গদর্শন ১২৮১ মাঘ

ম্যাকডোনেল-কথিত প্রথম কারণটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত স্মরণীয়।—

দেশের লোকের সমগ্র চিত্তে যখন কোনো একটি অভিপ্রায় জাগিয়া উঠে এবং সর্বসাধারণে সচেষ্ট হইয়া সেই অভিপ্রায়কে সার্থক করিতে চায় ও সেই অভিপ্রায়কে প্রতিকূল আঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্য ব্যূহবদ্ধ হইয়া উঠে, তখনই সে দেশ যথার্থভাবে ইতিহাসের ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়ায়।

এইরূপ কোনো একটি এক-অভিপ্রায়কে লইয়া ভারতবর্ষের কোনো একটি প্রদেশ আপনাকে একচিত্ত বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছে, এরূপ অবস্থা ভারতবর্ষের ভাগ্যে অধিক ঘটে নাই।

কোনো দেশের লোক যখন এইরূপ ঐক্য উপলব্ধি করে, তখন তাহারা স্বভাবতই সেই উপলব্ধিকে ইতিহাসে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। যে সকল ঘটনা বিচ্ছিন্ন, যাহা আকস্মিক, দেশের লোকের চিত্তে যাহার কোনো অখণ্ড তাৎপর্য নাই, দেশের লোক তাহাকে সহজেই ইতিহাসরূপে গাঁথিয়া রাখে না; কারণ গাঁথিয়া রাখার কোনো একটি সূত্র তাহারা নিজেদের মনের মধ্যে পায় না।....সমগ্র দেশের কোনো বিশেষ কালের ইতিহাসকে রক্ষা করিবার স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টা দেশের লোকের দ্বারা যদি ভারতবর্ষের কোথাও ঘটিয়া থাকে, সে মহারাষ্ট্র দেশে। মহারাষ্ট্রের বখরগুলি তাহার নিদর্শন। যে সময় লইয়া এই সকল জাতীয় ইতিবৃত্ত রচিত হইতেছিল, সেই সময়ে দেশের লোকে যে আপনাদের একটি অঙ্গবদ্ধ স্পষ্টসত্তা অনুভব করিয়াছিল, তাহা এই ইতিহাস লিখিবার প্রবৃত্তির দ্বারাই নিশ্চিত সপ্রমাণ হইতেছে। —শরৎকুমার রায়-প্রণীত 'শিবাজী ও মারাঠা জাতি' গ্রন্থের ভূমিকা (১৯০৮)।

ভারতীয় সাহিত্যে ইতিহাস নাই। তার কারণ ইহজীবনের প্রতি ভারতীয় চিত্তের বিমুখতা। ধর্মের প্রভাবে পারত্রিক চিন্তাই ভারতবর্ষে চিরকাল প্রাধান্য লাভ করেছে। ফলে ইহজীবনের কোনো বিশেষ অভিপ্রায়কে সার্থক করে তোলবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় চিত্ত কখনও একাগ্র হয়ে ওঠেনি, ভারতীয় জনসাধারণও তার প্রেরণায় কখনও বূ্যহবদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি। কালে কালে ভারতবর্ষে যে সব ঘটনা ঘটেছে, বিশেষ

অভিপ্রায়গত একচিত্ততার অভাবে তার মধ্যে ধারাবাহিকতা প্রকাশ পাবার সুযোগ হয়নি ; জাতীয় অভিপ্রায়গত যোগসূত্রের অভাবে বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি মানুষের মনে তথা স্মৃতিতে একটি সমগ্র ইতিহাসরূপে গ্রথিত হয়ে উঠতে পারেনি ।

২

বাংলার ইতিহাস নাই কেন ?

শুধু বিশাল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নয়, তার বিভিন্ন প্রদেশগুলি সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য । ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশগুলিরই ভাগ্যে কোনো বিশেষ লক্ষ্যকে আশ্রয় করে যথার্থ ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়াবার অবকাশ ঘটেনি । ভারতবর্ষের আঞ্চলিক ঘটনাপুঞ্জও তাই বিশিষ্ট ও সুস্পষ্ট ইতিহাসের মূর্তি ধরে আত্মপ্রকাশ করেনি । ধারাবাহিকতা-তথা আকারপ্রকার-হীন ঘটনাপুঞ্জের বিবরণকে ইতিহাস আখ্যা দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র । ভারতবর্ষের ইতিহাসহীন "হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী" ।

রাজপুতদের কিছু কিছু ইতিহাস পাওয়া যায় । কিন্তু গোত্র-ও বংশ-গত সংকীর্ণতার দ্বারা সে ইতিহাস বহুলাংশে খণ্ডিত । এই সংকীর্ণতার উর্ধ্বে সমগ্র রাজপুত জাতিকে আশ্রয় করে সে ইতিহাস কখনও অখণ্ড তাৎপর্যের অধিকারী হতে পারেনি । শিখদেরও কিছু ইতিহাস আছে । কিন্তু তাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ব্যর্থতার মধ্যে পর্যবসিত হয়েছে । ধর্মগত সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী

অতিক্রম করে সে ইতিহাস জাতীয়তার দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ পায়নি। একমাত্র মহারাষ্ট্রের ইতিহাস শিবাজীর প্রেরণায় কিছু কালের জন্য জাতীয় একচিত্ততার আলোকে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল।

ইতিহাসহীনতার কলঙ্ক বাঙালির ভাগ্যে অনপনেয় হয়ে রয়েছে। বাঙালি কখনও কোনো একাভিমুখী ব্রতের সাধনায় জাগ্রত ও উদ্যত হয়ে ওঠেনি। একদিকে রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ প্রভৃতি ভৌগোলিক বিভাগজনিত আঞ্চলিকতা, অন্য দিকে বংশ গোত্র গাঁই মেল কাপ প্রভৃতি সামাজিক বিচ্ছেদ এবং তৃতীয়তঃ শিব রাধাকৃষ্ণ চণ্ডী মনসা প্রভৃতি পৌরাণিক ও লৌকিক দেবতা নিয়ে ধর্মের দ্বন্দ্ব, এসবের ফলে বাংলার লোকসমাজ বহুধা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল। অঞ্চল সমাজ ও ধর্ম-গত বিচ্ছেদচেতনাকে অতিক্রম করে সমলক্ষ্যগত জাতীয় ঐক্যচেতনা দেখা দিতে পারেনি। কাজেই বাংলার সাহিত্যে মহারাষ্ট্রের বখরের মতো ইতিহাস রচনার প্রবৃত্তি জাগেনি। ইতিহাস-সাহিত্যের স্থান দখল করেছিল একদিকে স্মৃতিনিবন্ধ এবং অন্যদিকে কুলপঞ্জীসমূহ। বাংলার জাতীয় চরিত্রে ঐতিহাসিক উদ্যমের অভাব ছিল বলেই আমাদের মানসরাজ্যে রঘুনন্দন ও দেবীবর ঘটক এমন প্রতাপের সঙ্গে আধিপত্য করতে পেরেছেন। আজও বাংলার হিন্দু সমাজের পনেরো আনা লোক রঘুনন্দন এবং দেবীবরের আধিপত্যই স্বীকার করে চলছে। যাঁরা একান্তভাবেই সংকীর্ণতা ও বিচ্ছিন্নতার পতাকাবাহী, তাঁদের ছত্রচ্ছায়াতলে জাতীয়

ঐক্যসম্ভাবনার কথা কল্পনা করাও যায় না। কেন্দ্রাভিগ আকর্ষণের অভাবে বাঙালির সংহতি ঘটবার সুযোগও কখনও হয়নি। তাই বাংলার সংস্কৃত বা প্রাকৃত সাহিত্যে ইতিহাসের অঙ্কুরোদ্‌গমও ঘটতে পারেনি।

এই একটানা বিচ্ছিন্নতা ও ব্যর্থতার মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় শ্রীচৈতন্যের চরিত্রে। তাঁর মধ্যে ক্ষণকালের জন্য অতি আশ্চর্যভাবে এমন এক শক্তির স্ফুরণ দেখা গেল যা সহসা সমস্ত দেশব্যাপী বিচ্ছেদজালকে ছিন্ন করে জাতীয় চিত্তকে এক কেন্দ্রের অভিমুখে আকর্ষণ করে নিল। সেই আকর্ষণের প্রভাবে বাংলার অঞ্চল বর্ণ ও ধর্ম-গত বিভিন্নতা বহুলাংশেই স্বপ্নের মতো বিলীন হয়ে গেল। এমন কি হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যকেও স্বীকার করে নেওয়া অত্যাবশ্যক বলে গণ্য হল না। শুধু তাই নয়, বাংলা দেশ কিছুকাল সর্বভারতীয়তার বিশাল ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠা লাভ করল। এ শক্তি সামান্য নয়। বাংলার ইতিহাসে এরকম শক্তির আবির্ভাব সত্যই অভূতপূর্ব। চৈতন্যকে আশ্রয় করে বাংলা দেশে এই যে জাতীয় একচিত্ততা উদ্‌ভবের সূচনা হল, তার ফলে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রেও ইতিহাসরচনার প্রাথমিক উদ্যম দেখা দেয়। তার প্রমাণ চৈতন্যদেব ও তাঁর পারিষদগণের চরিতকাব্যগুলি। এই কাব্যগুলি দৃশ্যতঃ ধর্মগ্রন্থ বা কাব্যপর্যায়-ভুক্ত হলেও ইতিহাসরক্ষার আগ্রহই যে এসব গ্রন্থ রচনার মূল প্রেরণা তাতে সন্দেহ করা চলে না। বস্তুতঃ এই চরিতকাব্যগুলি তথা তারই আনুষঙ্গিক সাহিত্য থেকে চৈতন্যদেব

ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যেরূপ ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়, বাংলার জাতীয় জীবনের অন্য কোনো অঙ্গেরই তেমন ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। তার কারণ একমাত্র চৈতন্যপ্রবর্তিত আন্দোলনের মধ্যেই দেশের লোকের চিত্তে একটি বিশেষ অভিপ্রায় জেগে উঠেছিল এবং সে অভিপ্রায়কে সার্থক করে তোলবার জন্যে দেশের মধ্যে একটা সচেষ্ট ব্যূহবদ্ধতা দেখা দিয়েছিল; তাই সে আন্দোলন যথার্থ ইতিহাসের ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে পেরেছিল। ম্যাকডোনেলের ভাষায় বলা যায়—বাংলার বৈষ্ণবদের ইতিহাস পাওয়া যায়, কারণ তাঁরা ইতিহাস তৈরি করেছিলেন।

কিন্তু সে ইতিহাসও অর্ধপথেই স্তম্ভিত হয়ে যায়, পূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রসর হতে পারে নি। তার কারণও দুরূহ নয়। পঞ্জাবের শিখদের মতো বাংলার বৈষ্ণবদেরও একটা সংঘ গড়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু গুরু নানকের তিরোধানের পর শিখ সম্প্রদায়ের চিত্ত যেমন গুরুপারম্পর্যের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হবার সুযোগ পেয়েছিল, তেমন সুযোগ বাংলায় হয় নি; গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সামাজিক গঠনে সর্বাঙ্গীণ ঐক্য ও সংহতি দানের জন্য গুরুগোবিন্দের ন্যায় শক্তিধর পুরুষের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক অবকাশও দেখা দেয় নি। তার চেয়েও বড়ো কারণ এই যে, চৈতন্যপ্রবর্তিত ধর্ম ও সম্প্রদায় প্রথম থেকেই প্রতিষ্ঠিত ছিল অনৈহিকতার ভিত্তির উপরে। শিখ ও মারাঠার ইতিহাসে যে ঐহিক আদর্শের পরিচয় পাই, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের

ইতিহাসে তার লেশমাত্রও নেই। চৈতন্যদেবের চরিত্রেও ইহজীবনের প্রতি বিমুখতা একান্তভাবেই পরিস্ফুট ছিল। অধিকন্তু তাঁর আচরণে অনেক সময় এমনই ভগবৎতন্ময়তা প্রকাশ পেত যে, তাঁর শিষ্যরা তাতে তাঁর সম্বন্ধে অলৌকিকত্ব তথা অবতারত্ব আরোপে উৎসাহিত হতেন। বস্তুতঃ চৈতন্যদেবের জীবনকালেই তাঁকে কেউ কেউ প্রকাশ্যেই স্বয়ং ঈশ্বর বা শ্রীকৃষ্ণ বলে সম্বোধন বা বর্ণনা করতে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মে ভক্তিই একান্ত প্রাধান্য পেয়েছিল, জ্ঞান বা কর্মের স্থান নেহাতই নগণ্য ছিল। ভক্তিধর্মের একটা বৈশিষ্ট্যই এই যে, ও ধর্মের প্রবর্তকই কালক্রমে শিষ্যদের লক্ষ্যস্থানীয় হয়ে পড়েন; ফলে গুরু ও ঈশ্বরের অভিন্নতা অনায়াসেই স্থাপিত হয়ে যায়। চৈতন্যপ্রবর্তিত ধর্মের এই পরিণতিই তাকে অত্যল্পকালের মধ্যেই ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে অপসারিত করে। ইহলোক-বিমুখতা তথা দেবভক্তি অস্মজ্জাতির ইতিহাস না থাকার কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য প্রথমেই উদ্ধৃত করেছি। কাজেই অধুনাপূর্ব যুগে বাঙালি জাতি কখনও যথার্থ ঐতিহাসিক রঙ্গভূমিতে পদার্পণের গৌরব অর্জন করতে পারেনি, তাই তার ইতিহাসও রচিত হয়নি।

ঊনবিংশ শতকে রামমোহনপ্রবর্তিত ধর্মের আন্দোলন বাংলা দেশের ইংরেজি শিক্ষিত সমাজকে প্রবলভাবেই আলোড়িত করেছিল। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির নেতৃত্বে উক্ত সমাজের একাংশে অভিপ্রায়গত ঐক্য এবং সংঘবদ্ধতাও দেখা

দিয়েছিল। ফলে বাংলার ব্রাহ্ম সমাজ যথার্থ ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল। তাই তার ইতিহাসও পাওয়া যায়। কিন্তু এই ধর্ম আন্দোলন নানা কারণে সমগ্র জাতিগত ব্যাপকতা লাভ করতে পারে নি ; তা ছাড়া সংঘভেদের ফলে তার ঐক্য বিনষ্ট ও বেগ মন্দীভূত হয়ে গেল। রামমোহনপ্রবর্তিত ধর্মোদ্‌বোধনের প্রবল ধারাও এভাবে পূর্ণ পরিণতির মোহনায় পৌঁছবার পূর্বেই অসার্থকতার বালুভূমিতে বিলীন হয়ে গেল।

একমাত্র সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রেই বাঙালি জাতি অনেকাংশে সাফল্য লাভ করেছে। তাই তার সাহিত্যের ইতিহাসই রচিত হয়েছে সর্বাগ্রে। সে ইতিহাসের উপাদানের অভাব ঘটেনি। বরং দিনদিনই সে উপাদান অধিকতর পরিমাণে আবিষ্কৃত হচ্ছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিগত কালের ঐতিহাসিক বেগ থাকার ফলেই আধুনিক কালে বাংলা সাহিত্য ইংরেজির প্রভাবে অভিভূত না হয়ে বরং নূতন তেজে উজ্জীবিত হয়ে উঠতে পেরেছে।

৩

বাংলার জাগরণ

কর্মসাধনার ক্ষেত্রে বাঙালি একেবারেই নিঃস্ব ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। কর্মের ক্ষেত্রে কীর্তি অর্জন করতে হলে লক্ষ্যগত যে সংকল্প ও সমগ্রতা অত্যাবশ্যক, কৃষিজীবিকা তথা পল্লী-গতপ্রাণ বাঙালির বহুধাবিচ্ছিন্ন জাতীয় জীবনে সে সংকল্প

ও সমগ্রতা কখনও দেখা দেয় নি। সুতরাং আমাদের দেশ যদি কখনও ইতিহাসলক্ষ্মীর প্রসন্নতা লাভ না করে থাকে তাতে বিস্ময়ের হেতু নেই। কেননা জাতীয় কর্মকীর্তিই হচ্ছে ইতিহাসলক্ষ্মীর মুখ্য বাহন। কিন্তু অবশেষে একদিন—

ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম, উঠিল কল-স্বর।
গাছের শাখে জাগিল পাখি, কুসুমে মধুকর॥
অশ্বশালে জাগিল ঘোড়া, হস্তিশালে হাতি।
মল্লশালে মল্ল জাগি ফুলায় পুন ছাতি॥
জাগিল পথে প্রহরীদল, দুয়ারে জাগে দ্বারী।
আকাশে চেয়ে নিরখে বেলা জাগিয়া নরনারী॥
নূতন-জাগা কুঞ্জবনে কুহরি উঠে পিক।
বসন্তের চুম্বনেতে বিবশ দশ দিক্॥
বাতাস ঘরে প্রবেশ করে ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে।
নবীন ফুল-মঞ্জরীর গন্ধ লয়ে আসে॥
জাগিয়া উঠি বৈতালিক গাহিছে জয়-গান।
প্রাসাদ-দ্বারে ললিত স্বরে বাঁশিতে উঠে তান॥

বৈতালিকের হাতে শুধু যে ললিত সুরের বাঁশিই ছিল তা নয়, তার শিঙাতে 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়' এই নিদ্রাবিদারী বজ্রবাণীও ঘোষিত হয়েছিল। তার উদ্‌বোধনমন্ত্র ছিল—

যাও সিন্ধুনীরে ভূধরশিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে

বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধরে
স্বকার্যসাধনে প্রবৃত্ত হও।

তার বাণী ছিল, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'।

ইউরোপের কর্মচঞ্চল চিত্তের সংঘাতে বাঙালির নিশ্চল মনেও কর্মপ্রেরণার ঢেউ জেগে উঠল ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদে। এই কর্মপ্রেরণা তৎকালীন মনস্বী বাঙালির মনে কি ভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল, কোন্ ভাবী আশার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিল, তার পরিচয়স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি।—

আজ বঙ্গভূমির আনন্দ-উৎসব ভারতবর্ষের চারিদিক্ হইতে শুনা যাইতেছে। আজ ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে যে নব জাতির জন্মসংগীত গান হইতেছে, ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তে পশ্চিমঘাট গিরির সীমান্ত দেশে বসিয়া আমি তাহা শুনিতে পাইতেছি।...

বিপুল মানবশক্তি বাংলা সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছে, ইহা আমি দূর হইতে দেখিতে পাইতেছি। ইহার প্রভাব অতিক্রম করিতে কে পারে? এ আমাদের সংকীর্ণতা আমাদের আলস্য ঘুচাইয়া তবে ছাড়িবে। আমাদের মধ্যে বৃহৎ প্রাণ সঞ্চার করিয়া সেই প্রাণ পৃথিবীর সহিত যোগ করিয়া দিবে। আমার মনে নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে, বাঙালির একটা কাজ আছেই। আমাদের লজ্জা একদিন দূর হইবে। ইহা আমরা হৃদয়ের ভিতর হইতে অনুভব করিতেছি।...

আমার তো আশা হইতেছে আমাদের মধ্যে এমন সকল

বড়োলোক জন্মিবেন যাঁহারা বঙ্গদেশকে পৃথিবীর মানচিত্রের শামিল করিবেন ও এরূপে পৃথিবীর সীমানা বাড়াইয়া দিবেন।

—বালক, ১২৯২ পৌষ

রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার পদ্যরচনাতেও বাঙালির আশানিষ্ঠ কর্মোন্মুখতার পরিচয় অনুরূপ দৃঢ়তার সহিতই প্রকাশ পেয়েছে।—

পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ, শুনিতে পেয়েছি ওই—
সবাই এসেছে লইয়া নিশান, কইরে বাঙালি কই ?...
বঙ্গের কুটিরে এসেছে বারতা, শুনেছে কি তাহা সবে ?
জেগেছে কি কবি শুনাতে সে কথা জলদগম্ভীর রবে ?
সুখদুঃখ লয়ে অনন্ত সংগ্রাম, জগতের রঙ্গভূমি—
হেথায় কে চায় ভীরুর বিশ্রাম, কেন গো ঘুমাও তুমি ?
মানবের কাজে মানবের মাঝে আমরা পাইব ঠাঁই,
বঙ্গের দুয়ারে তাই শিঙ্গা বাজে, শুনিতে পেয়েছি ভাই।
মুছে ফেলো ধুলা, মুছ অশ্রুজল, ফেলো ভিখারীর চীর,
পরো নব সাজ, ধরো নব বল, তোলো তোলো নতশির।

—আহ্বানগীত, বালক, ১২৯২ পৌষ

শুধু হেমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ নয়, বঙ্কিমচন্দ্র-সুরেন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-প্রমুখ সমস্ত চিন্তানায়কদের কণ্ঠেই তখন কর্মপ্রেরণার বাণী শতধারায় উদ্‌ঘোষিত হচ্ছিল। বাঙালির প্রাণ কর্মোন্মাদনার তাড়নায় উদ্‌বেল হয়ে উঠছিল। অবশেষে বাঙালির

কর্মসাধনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার সুযোগ এল ১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগ উপলক্ষ্যে। বাঙালির জীবনে তখনই প্রথম দেখা দিল অভিপ্রায়গত একচিত্ততা এবং জীবনসংগ্রামে বদ্ধপরিকরতা। কোটি কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত হল বন্দেমাতরম্ মন্ত্র, উদ্‌গীত হল প্রার্থনার সামগীতি—

বাঙালির পণ, বাঙালির আশা
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা,
সত্য হউক সত্য হউক সত্য হউক, হে ভগবান্।
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন,
বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন,
এক হউক এক হউক এক হউক, হে ভগবান্॥

বাঙালির কর্মকীর্তিহীন শতচ্ছিন্ন জাতীয় জীবনে এই প্রথম দেখা দিল কর্মসাধনার প্রয়াস, দেখা দিল ব্যূহবদ্ধতা। ফলে ১৯০৫ সাল থেকে বাঙালি সর্বপ্রথম যথার্থ ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হল; তারপর থেকে বাঙালির ইতিহাস আছে, কেননা তখন থেকেই সে ইতিহাস তৈরি করছে। তার পূর্বে বাঙালির ইতিহাস ছিল না; ছিল শুধু পুরাণকথা বা ইতিবৃত্ত।

উদ্‌যোগ-পর্ব

১৯০৫ সালের পূর্ববর্তী নব্বই বৎসরকে যথার্থতঃ বাংলার ইতিহাসের উদ্‌যোগপর্ব বলে গণ্য করা যায়। ১৮১৪ সালে

যেদিন রামমোহন রায় স্থায়িভাবে কলকাতায় বাস স্থাপন করলেন সেদিন থেকে উদ্‌যোগ পর্বের আরম্ভ। এই পর্বে বাঙালির মনে কোনো একাগ্রতা দেখা দেয় নি; কিন্তু রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ-প্রমুখ চিন্তা- ও কর্ম-বীরগণ জাতীয়চিত্তে একাগ্রতা সৃষ্টির সাধনাতেই আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। বস্তুতঃ তাঁরা ছিলেন বাংলার যথার্থ ইতিহাস রচনার অগ্রদূত। তাঁদেরও পূর্বে যে সুদীর্ঘ কাল বহু শতাব্দী জুড়ে সুদূর অতীতের দিকে প্রসারিত, সে কালে বাংলার জাতীয় ইতিহাসের অরুণোদয়ও হয়নি, সে কাল হচ্ছে যথার্থতঃ পুরাণ-কাহিনী বা পুরাতত্ত্বের 'অন্ধতামসী যামিনী'।

যে কালকে বলেছি বাংলার যথার্থ ইতিহাস রচনার উদ্‌যোগ পর্ব (১৮১৪-১৯০৫), সে কালেই বাঙালির মনে ঐতিহাসিক চেতনার উদ্‌বোধন ঘটে। জাতীয় চিত্তে ইতিহাস রচনার প্রেরণা আসে দুই ভাবে। কোনো জাতি যখন তার ব্যূহবদ্ধ জীবনে ঐক্যশক্তিকে উপলব্ধি করে এবং সে-শক্তিকে নানা সাধনার মধ্যে কর্মের রূপ দেয়, তখন সে ওই উপলব্ধিকে তথা তার সাধনার ফলাফলকে ইতিহাসে প্রকাশ না করে পারে না। তখন যে ঐতিহাসিক চেতনা সঞ্জাত হয় এবং যে ইতিহাস লিখিত হয় তাই হচ্ছে যথার্থ ইতিহাস, অর্থাৎ জাতীয় জীবনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ। আবার কোনো জাতি যখন দীর্ঘকালীন সুপ্তির অব-সানে নবপ্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে কর্মসাধনায় উদ্যত হয় তখনও সে তার অতীত ইতিহাস রচনার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

কেননা, বিগতকালের ইতিহাসই হচ্ছে অনাগত কালের ইতিহাস রচনায় প্রেরণা ও শক্তি জোগাবার প্রধান উৎস। অতীতের কর্মকলাপ ও অভিজ্ঞতার রসধারায় পরিপুষ্ট হয়েই তো ভবিষ্যৎ ইতিহাসের মহীরুহ ঊর্ধ্ব আকাশে সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি পায়। বলা বাহুল্য বাঙালির ইতিহাস রচনার সমস্ত প্রয়াসই এই দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্গত। পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক উদ্‌যোগপর্বের শেষের দিকে সে কর্মজীবনের মহাসাগরতীরে উপনীত হয়ে শক্তিসংগ্রহের ব্যাকুল আগ্রহে অতীতের দিকে ফিরে তাকাল, অন্ধকারের মধ্যেও কোথাও আলোকরেখার সন্ধান পাওয়া যায় কিনা সেই আশায়। বাঙালির মর্ম মন্থন করে তখন এই আকুতি উত্থিত হল—

হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার কথা কও, কথা কও।
তুমি জীবনের পাতায় পাতায় অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোলো নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে বও ;
ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত, কথা কও, কথা কও।

এই মর্মোদ্গত আকাঙ্ক্ষার বশেই কবিদের কণ্ঠে উৎসারিত হল 'অতীতগৌরববাহিনী বাণী'—

ওরে চেয়ে দেখ্ মুখ আপনার, ভেবে দেখ্ তোরা কারা।
মানবের মতো ধরিয়া আকার, কেন রে কীটের পারা ?

আছে ইতিহাস, আছে কুলমান, আছে মহত্ত্বের খনি,
পিতৃপিতামহ গেয়েছে যে গান, শোন্ তার প্রতিধ্বনি ॥

—রবীন্দ্রনাথ, বালক, ১২৯২ পৌষ

একদা যাহার বিজয়-সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত-সাগরময়,
সন্তান যার তিব্বত-চীন-জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তার কি না এই ধুলায় আসন, তার কি না এই ছিন্ন বেশ !

—দ্বিজেন্দ্রলাল, গান

বাঙালি অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ংকর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালি দীপংকর।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি
বাঙালির ছেলে ঘরে ফিরে এল যশের মুকুট পরি'।
এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।....
অতীতে যাহার হয়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে,
বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙালির গৌরবে ॥

—সত্যেন্দ্রনাথ, কুহু ও কেকা, আমরা

অনাগতকালে গৌরব অর্জনে প্রেরণা ও শক্তি সংগ্রহের আগ্রহেই তৎকালীন বাঙালি বিগতকালের ইতিহাসের ভাণ্ডারদ্বার উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হয়েছিল। বস্তুতঃ—

বিশ্ব-বাংলা উঠছে গড়ে, জাগছে প্রাণের তীর্থ গো,
জাতির শক্তি-পীঠ জগতে গড়ছে মোদের চিত্ত গো।

তার পিছনে দাঁড়িয়ে তুমি মোদের স্বদেশ-মাতৃকা,
দিচ্ছ বুদ্ধি দিচ্ছ গো বল জ্বালিয়ে আঁখির স্থিরশিখা।
—সত্যেন্দ্রনাথ, অভ্র-আবীর, গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি

কবির এই উপলব্ধি ঊনবিংশ শতকের শেষাংশ ও বিংশ শতকের প্রথমাংশের শিক্ষিত বাঙালিমাত্রেরই হৃদ্‌গত অনুভূতির পরিচায়ক। এই ভাবের প্রেরণায় বাঙালির মন শুধু যে কাব্য-নিকুঞ্জে অতীত গৌরবগুঞ্জনেই পরিতৃপ্ত হয়েছিল তা নয়, গদ্য-সাহিত্যের কঠোর চিন্তাক্ষেত্রেও পুরাতত্ত্বের সন্ধানে ব্রতী হয়েছিল। বাংলার পুরাবৃত্ত সন্ধানে যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের নেতা ও উৎসাহদাতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪)। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনই রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-৮৬)-প্রমুখ তৎকালীন বাঙালি পুরাতাত্ত্বিকদের মুখ-পত্রের স্থলবর্তী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রই একদিন (১২৮৭ অগ্রহায়ণ) দেশের ইতিহাস উদ্ধারে ব্রতী হবার জন্যে বাঙালি জাতিকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন—

বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে তাহা ইতিহাস নয়।... বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে?

তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্বসাধারণের মা

জন্মভূমি বাঙ্গালা দেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই ?

আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যতদূর সাধ্য, সে ততদূর করুক ; ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।

—বঙ্গদর্শন, বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

এই প্রকাশ্য আহ্বানের বহু পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও বাংলার পুরাতত্ত্ব সন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন এবং অন্যকেও প্রবর্তিত করেছিলেন। ১২৮১ সালে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 'প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' নামক ক্ষুদ্র পুস্তকের সমালোচনা উপলক্ষ্যে তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্তি, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধচরিত ও গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই। মার্শম্যান, ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি ; সে কেবল সাধ-পূরাণ মাত্র।" অতঃপর এ সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তাও এস্থলে উদ্‌ধৃত করা প্রয়োজন।—

এক্ষণে বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধার কি অসম্ভব ? নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু সে কার্যে ক্ষমতাবান্ বাঙ্গালি অতি অল্প। কি বাঙ্গালি, কি ইংরেজ, সকলের অপেক্ষা যিনি এই দুরূহ কার্যের যোগ্য তিনি ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন না। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র

মনে করিলে স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে পারিতেন।... রাজকৃষ্ণবাবুও মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন; তাহা না লিখিয়া তিনি বালকশিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টি ভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে।

মুষ্টিভিক্ষা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি। গ্রন্থখানি মোটে ৯০ পৃষ্ঠা, কিন্তু ঈদৃশ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাস বোধ হয় আর নাই।...ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকামাত্র নহে; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস।...কেবল বালক নহে, অনেক বৃদ্ধ ইহাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারেন।...সকল অধ্যয়নীয় তত্ত্বই ইহাতে পাওয়া যায়।

—বঙ্গদর্শন, ১২৮১ মাঘ

৫

ইতিহাসের দ্বারমোচন

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 'প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস'-খানিই (১৮৭৪) বাংলা দেশের প্রথম উল্লেখযোগ্য সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ পুরাবৃত্তগ্রন্থ বলে স্বীকৃত হতে পারে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত পৌনে এক শো বছরের মধ্যে বাংলার পুরাবৃত্তচর্চা কতখানি অগ্রসর হয়েছে ভেবে দেখা দরকার। তৎপূর্বে এই পুরাবৃত্তচর্চার ভাষা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দুএকটি কথা স্মরণীয়।

ওআরেন হেস্‌টিংস্‌এর আমলে সার উইলিআম জোন্‌স্‌ যেদিন কলকাতার এশিআটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল নামক অনুসন্ধানসমিতির প্রতিষ্ঠা করেন (১৭৮৪), সেদিন থেকে বাংলা তথা ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তচর্চা রীতিমত আরম্ভ হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ফরাসি-বিপ্লবের ফলে যে সময়ে ইউরোপের রাজনীতির ক্ষেত্রে নূতন যুগের সূচনা হচ্ছিল, ঠিক সে সময়েই উক্ত এশিআটিক সোসাইটিকে কেন্দ্র করে সার চার্লস উইলকিন্‌স, সার উইলিআম জোন্‌স্‌, এইচ. টি. কোলব্রুক-প্রমুখ মনীষীদের প্রবর্তনায় ভারতীয় সংস্কৃতিজগতের আবিষ্কারের ফলে বাংলা দেশেও এক নূতন যুগের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হচ্ছিল। এই দ্বার হচ্ছে পুরাবৃত্তের দ্বার। এই দ্বারপথে প্রবেশ করে বাঙালির মন ক্রমে ক্রমে ভারতীয় সংস্কৃতির যে আশ্চর্য সাতমহলা প্রাসাদ আবিষ্কার করল, তার মহলে মহলে যে ঐশ্বর্যের সন্ধান পেল, তাতে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। অবশেষে এই পুরাজ্ঞানের সোনার কাঠির স্পর্শে ওই সাতমহলা ভবনের কেন্দ্রবর্তিনী ভারতীয় প্রাণলক্ষ্মী যখন দীর্ঘ সুপ্তির অবসানে নব প্রভাতের আলোকে জেগে উঠলেন, তখন দেশে যে নবচেতনার সাড়া দেখা দিল ভারতীয় ইতিহাসে তার তুলনা নেই। ওই প্রবেশপথেই বাংলা দেশের পুরাবৃত্তের কক্ষটিও ক্রমে ক্রমে উন্মুক্ত হল; কিন্তু সেই অন্ধকার কক্ষের বিভিন্ন অংশকে যথোচিতভাবে আলোকিত করতে অতি দীর্ঘকালব্যাপী পুরাচর্চার

প্রয়োজন হয়েছে। অতি স্বাভাবিকভাবেই অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী কালের উপরে ইতিহাসের আলোকপাত হয়েছে আগে এবং দূরবর্তী কালের উপরে হয়েছে তার পরে। চার্লস্ স্টুআর্টের **History of Bengal** (১৮১৩) বইটিই আধুনিক যুগে রচিত বাংলার প্রথম ইতিবৃত্ত। এটিতে তুর্কিবিজয়ের সময় থেকে পলাশির যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলার পুরাবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। তুর্কি-বিজয়ের পূর্ববর্তী কাল সম্বন্ধে এই পুস্তকে (**p. vii-viii**) বলা হয়েছে—

Although the Hindus of Bengal have an equal claim to antiquity and early civilisation with the other nations of India, yet we have not any authentic information respecting them during the early ages of their progress; nor is there any other positive evidence of the ancient existence of Bengal, as a separate kingdom, for any considerable period, than its distinct language and peculiar written character···As I am credibly informed that materials have been and are still collecting for furnishing an authentic account of the Hindu governments, I shall dwell no longer on the subject, in the hope that we shall one day be favoured with a history of Bengal from the pure mine of Sanskrit literature.

স্টুআর্ট সাহেবের আশা কিন্তু ফলবতী হয়নি; বাংলার তুর্কিপূর্ব যুগের যথার্থ ইতিবৃত্ত রচিত হতে এক শো বছরেরও বেশি সময় লেগেছে। কেননা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত প্রথম খণ্ড **History of Bengal**-ই (১৯৪৩) হচ্ছে উক্ত

যুগের প্রথম যথার্থ ইতিহাস। অথচ স্টুআর্টের বইখানি (১৮১৩) প্রকাশিত হবার পূর্ব থেকেই তুর্কিপূর্ব বাংলার পুরাবৃত্ত সন্ধানের কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ১৭৮০ সালে বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সার চার্লস উইলকিন্‌স্‌ দিনাজপুরের অন্তর্গত বাদাল নামক স্থানে গরুড়স্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ একটি লিপির বিষয় অবগত হন। আট বৎসর পরে ১৭৮৮ সালে তিনি এশিআটিক সোসাইটির পত্রিকার প্রথম খণ্ডে এই লিপিটির একটি ইংরেজি মর্মানুবাদ প্রকাশ করেন (**Asiatic Researches vol. I,** পৃ ১৩১)। এই সময় থেকেই বাংলার পুরাবৃত্তচর্চার সূত্রপাত হল বলে ধরা যেতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয় যে, এই উইলকিন্‌স্‌ সাহেবই হচ্ছেন প্রথম যথার্থ সংস্কৃত-জানা ইউরোপীয় এবং তিনিই ভগবদ্‌গীতার প্রথম ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন (১৭৮৫)। আবার এই উইলকিন্‌স্‌ই হচ্ছেন বাংলা টাইপ নির্মাণ তথা বাংলা মুদ্রণের পথপ্রদর্শক। তাঁর প্রবর্তনায় উদ্‌ভাবিত বাংলা টাইপের প্রথম প্রয়োগ হয় হালহেড সাহেবের ইংরেজি ভাষায় লেখা বাংলা ব্যাকরণে (১৭৭৮)। এই ঘটনার গুরুত্ব অপরিমেয়। বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবের ফলে বাঙালির জাতীয় জীবনে এক নবযুগের দ্বারোদ্‌ঘাটন হল, একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং উইলকিন্‌স্‌ সাহেব একাধারে বাংলার ইতিহাসের নবযুগস্থষ্টি তথা বাংলার পুরাতত্ত্বসাধনা, এই দুএরই সূত্রধার বলে স্বীকৃত হতে পারেন। তাঁর পরেই নাম করতে হয়

এইচ. টি. কোলব্রুকের। বস্তুতঃ তিনিই ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব তথা প্রত্নতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা বলে স্বীকৃত। ১৮০৭ সালে তিনি এশিআটিক রিসার্চেজ পত্রিকায় রণবঙ্কমল্লদেবের ময়নামতী (ত্রিপুরা জেলা) -লিপি এবং তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের আমগাছি (দিনাজপুর জেলা) -লিপি মূল-সংস্কৃতপাঠ ও ইংরেজি অনুবাদ সহ প্রকাশ করেন। পূর্বোক্ত বাদাল গরুড়স্তম্ভলিপি এবং এই আমগাছি-লিপি থেকেই বাংলার পালরাজবংশের ইতিহাসের মূল কাঠামোটি জানা যায়। শুধু রাজকীয় ইতিহাস নয়, প্রাচীন বাংলার জনপদপরিচয় তথা সামাজিক ইতিহাসের সম্ভাবনাও দেখা দেয় কোলব্রুকের গবেষণা (১৭৯৮) থেকেই। তারপর সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরেই বাংলার তিমিরাচ্ছন্ন অতীতের উপরে মাঝে মাঝে পুরাবৃত্তসন্ধানের আলোকপাত হয়েছে। তথাপি এক শতাব্দীর মধ্যেও একখানি পূর্ণাঙ্গ বাংলার ইতিবৃত্ত রচিত হয়নি, এমন কি দীর্ঘ কালের মধ্যে সে আগ্রহও দেখা যায়নি। এই অনাগ্রহের কারণগুলিও বিবেচ্য।

৬

বঙ্কিমচন্দ্র

ঐতিহাসিক চেতনা হচ্ছে জাগ্রত জাতির লক্ষণ। সুপ্ত জাতির যেমন ভাবী কালের ইতিহাসসৌধ গড়ে তোলবার উদ্যম থাকে না, তেমনি বিগত কালের ইতিবৃত্ত সন্ধানের আগ্রহও থাকে না। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকে বাংলার (তথা ভারতবর্ষের)

পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে যা কিছু আলোকপাত হয়েছে তা হচ্ছে মুখ্যতঃ পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের গবেষণার ফল। এই গবেষণার মূলে জাতীয় জাগরণ বা গৌরববোধের প্রেরণা ছিল না, ছিল বিশুদ্ধ জ্ঞানসাধনার প্রবর্তনা। আর ওই গবেষণা স্বভাবতঃই প্রকাশিত হত ইংরেজি ভাষায়। অতঃপর রাজেন্দ্রলাল-প্রমুখ যেসব ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি বিদেশী মনস্বীদের পদানুসরণ করে গবেষণার পথে অগ্রসর হলেন তাঁরাও আশ্রয় করলেন ইংরেজিকেই। ইংরেজির কঠিন প্রাচীরবেষ্টিত পাণ্ডিত্যের দুর্গে সাধারণ বাঙালির প্রবেশাধিকার ছিল না; আত্মসংবিৎহীন বাঙালির সে দুর্গম পথে পদার্পণের আগ্রহমাত্রও ছিল না।

এমন সময় এলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি কঠিন আঘাত করেই বাঙালির মন থেকে ইংরেজির মোহকে ভেঙে দিলেন, গবেষণা-দুর্গের ইংরেজি-প্রাচীর ভেঙে পড়ল নানা দিকে। অনলস কণ্ঠে অবিরাম আহ্বানের দ্বারা বাঙালিকে জাগাবার ভারও নিলেন তিনিই। অতঃপর তিনি স্বজাতিকে ডেকে বললেন, "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি" (১২৮৭ অগ্রহায়ণ)। বলতে গেলে বাংলার যথার্থ ঐতিহাসিক অনুসন্ধান আরম্ভ হয় এই সময় থেকেই। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ইস্কুলপাঠ্য 'প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস'-নামক বইখানি (১২৮১) স্বর্ণময় হলেও 'মুষ্টিভিক্ষা'-মাত্রই, তদতিরিক্ত কিছু

নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষমতা তার ছিল না। তাই তো বাংলার ইতিহাস সন্ধানে সমবেত প্রয়াসের জন্য তাঁকে এমন করে আহ্বান জানাতে হয়েছিল। তিনি শুধু সকলকে আহ্বান করেই নিরস্ত হননি, তিনি নিজেও ওই সন্ধানকার্যে অগ্রসর হয়েছিলেন। বস্তুতঃ এই আহ্বানের (১২৮৭), এমন কি উক্ত স্বর্ণময় মুষ্টিভিক্ষা প্রাপ্তির (১২৮১), পূর্বেই তিনি এই কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার' (বঙ্গদর্শন, ১২৮০ ভাদ্র, ১২৮২ অগ্রহায়ণ) প্রবন্ধে যে পুরাবৃত্ত আলোচনার সূত্রপাত হয়, পরবর্তী কালে অনেক প্রবন্ধে তার পরিণতি দেখা যায়। বাঙ্গালির বাহুবল (১২৮১ শ্রাবণ), বাঙ্গালার ইতিহাস (১২৮১ মাঘ), বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা (১২৮৭ অগ্রহায়ণ), বাঙ্গালির উৎপত্তি (১২৮৭ পৌষ—১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ), বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ (১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ), বঙ্গদর্শনের এই প্রবন্ধাবলী এবং প্রচারের বাঙ্গালার কলঙ্ক (১২৯১ শ্রাবণ) প্রবন্ধে বাংলার পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এক কথায় বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলার পুরাবৃত্ত সন্ধানের প্রথম উদ্দেশ্য বাঙালির ঐতিহ্যগত কলঙ্কমোচন, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ভাবী কালে বাঙালির গৌরব অর্জনে প্রেরণাদান। এই প্রসঙ্গে তাঁর নিজের উক্তি উদ্ধৃত করাই সমীচীন।—

যাহা ভারতের কলঙ্ক, বাঙ্গালারও সেই কলঙ্ক। এখানে আরও দুর্ভেদ্য অন্ধকার। কদাচিৎ অন্যান্য ভারতবাসীর বাহুবলের প্রশংসা শুনা যায়, কিন্তু বাঙ্গালির বাহুবলের প্রশংসা কেহ

কখন শুনে নাই।...যে বলে যে, বাঙ্গালির চিরকাল এই চরিত্র, বাঙ্গালি চিরকাল দুর্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা। এ নিন্দার কোন মূল ইতিহাসে পাই না।...বাঙ্গালির চিরদুর্বলতা এবং চিরভীরুতার আমরা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই না। কিন্তু বাঙ্গালি যে পূর্বকালে বাহুবলশালী, তেজস্বী, বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই। —বাঙ্গালার কলঙ্ক

ঐতিহ্যগত অপবাদ নিরসনের প্রয়াস এই উক্তিতে সুস্পষ্ট। ভাবী গৌরব অর্জনের সাধনায় বাঙালির মনে শক্তিসঞ্চারের আকাঙ্ক্ষা বঙ্কিমের হৃদয়ে কিরূপ প্রবল ছিল তারও একটু নিদর্শন দিচ্ছি।—

বাঙ্গালির এক্ষণে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। বাঙ্গালি সর্বদা উন্নতির জন্য ব্যস্ত। অনেকে তদ্‌বিষয়ে বিশেষ গুরুতর আশা করেন না। কেন না বাঙ্গালির বাহুবল নাই। বাহুবল ভিন্ন উন্নতি নাই, ইহা তাঁহাদিগের বিশ্বাস।...

বেগবৎ অভিলাষ হৃদয়মধ্যে থাকিলে উদ্যম জন্মে। যখন অভিলাষ এরূপ বেগলাভ করে যে, তাহার অপূর্ণাবস্থা বিশেষ ক্লেশকর হয়, তখন অভিলষিতের প্রাপ্তির জন্য উদ্যম জন্মে।...

যখন বাঙ্গালির হৃদয়ে সেই এক অভিলাষ জাগরিত হইবে, যখন বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষের বেগ গুরুতর হইবে, তখন উদ্যমের সঙ্গে ঐক্য মিলিত হইবে।...

যদি কখন বাঙ্গালির কোন অভিলাষ প্রবল হয়, যদি বাঙ্গালি

মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয়, যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে, তদর্থে লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, যদি সেই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গালির অবশ্য বাহুবল হইবে।

বাঙ্গালির এরূপ মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটিবে না, একথা বলিতে পারা যায় না। যে কোন সময় ঘটিতে পারে।

—বাঙ্গালির বাহুবল

বাঙালির মনে কোনো একাভিলাষ প্রবল হয়ে তাকে যে-কোনো সময়ে প্রাণদানেও প্রবৃত্ত করতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্রের এই আশা (১৮৭৪) সত্যে পরিণত হতে ত্রিশ বছরের বেশি লাগেনি। ১৯০৫ সালের বঙ্গবিপ্লবের মধ্যেই উক্ত আশার মূর্ত প্রকাশ ঘটেছিল। এই বিপ্লবের উদ্‌যোগপর্বের প্রধান নেতার ভূমিকাতেই অধিষ্ঠিত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, যেমন ফরাসি-বিপ্লবের অগ্রদূত ছিলেন ভলটেয়ার, রুসো প্রভৃতি। এই বঙ্গবিপ্লবের সমিধ্‌ সংগ্রহে তিনি কি একাগ্রচিত্তে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তার অজস্র নিদর্শন পাই তাঁর প্রবন্ধাবলীতে, তাঁর উপন্যাসগুলিতে, বিশেষভাবে তাঁর কমলাকান্তে, আনন্দমঠে ও বন্দেমাতরম্‌ গানে। যাহোক, বাঙালির মনে ভাবী গৌরবের প্রবল একাভিলাষ জাগিয়ে তোলবার জন্যেই তিনি বাংলার ইতিবৃত্তচর্চায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং অন্যকে প্রবর্তনা দিয়েছিলেন। "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালির ভরসা নাই" এই ছিল তাঁর বাণী। তিনি জানতেন ভাবী কালের জীবনসংগ্রামে

জয়ী হতে হলে অতীত ইতিহাসের অস্ত্রশালা থেকেই আয়ুধ সংগ্রহ করতে হয়।

বস্তুতঃ এই অভিপ্রায় নিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র এক সময়ে বাংলার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করে একখানি বাংলার ইতিহাস লেখবার ইচ্ছা করেছিলেন। নানা কারণে শেষ পর্যন্ত ওই অভিপ্রায় পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বঙ্গদর্শনে যে কয়েকটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তার উদ্দেশ্য অন্যকে প্রবর্তনাদান। এ সম্পর্কে তাঁর উক্তিই উদ্‌ধৃত করি।—

অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। যেমন কুলি-মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্যসেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারির ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ।... কিন্তু কৈ, আমি তো কুলি-মজুরের কাজ করিয়াছি—এপথে সেনা লইয়া কোন সেনাপতির আগমন-বার্তা তো শুনিলাম না।

—বিবিধপ্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপন, ১৮৯২

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, বাল্যকাল থেকেই ইতিহাসের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগ ছিল। ১৮৪৯ সালে তিনি যখন হুগলি-কলেজের স্কুল-বিভাগে ভর্তি হন তখন তাঁকে ইংলণ্ডের ইতিহাসের ন্যায় 'বঙ্গেতিহাস'ও পড়তে হত (সাহিত্যসাধক-

চরিতমালা, পৃ ১০ ও ১৮)। এই বঙ্গেতিহাস কার রচিত জানি না"। তবে এটুকু জানি যে, তখনকার দিনে বিদ্যালয়গুলিতে বাংলার ইতিহাস পড়বার রীতি প্রচলিত ছিল এবং এই প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে মার্শম্যানের **History of Bengal**এর কয়েকখানি বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ (১৮৪৮) বিশেষভাবে স্মরণীয়। সম্ভবতঃ হুগলি কলেজে পড়বার সময় থেকেই ইংলণ্ডের ইতিহাসের তুলনায় বাংলার ইতিহাসের ক্ষীণতা ও দীনতা বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্তকে পীড়িত করতে শুরু করে। এই বেদনাই কালক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে তাঁকে বাংলার ইতিহাস উদ্ধারে প্রবর্তিত করে। এস্থলে একথাও বলা যেতে পারে যে, বাংলার ইতিহাসের প্রতি এই বেদনাজাত অনুরাগ তাঁর উপন্যাসগুলিতেও প্রতিফলিত হয়েছে। এক রাজসিংহ ব্যতীত তাঁর সব উপন্যাসেরই ঐতিহাসিক ভূমিকা রচিত হয়েছে বাংলার ইতিহাসেরই কোনো না কোনো কাহিনীকে অবলম্বন করে। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী, সীতারাম প্রভৃতি নাম স্মরণ করলেই একথার সার্থকতা বোঝা যাবে।

৭

রবীন্দ্রনাথ

মৃত্যুর (১৮৯৪) অল্পকাল পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের এই আক্ষেপোক্তি। কিন্তু বাংলার ইতিহাস রচনার জন্যে তিনি যে

পথপ্রদর্শন ও প্রেরণাদান করে গেলেন, তাঁর মৃত্যুর প্রায় অব্যবহিত পরেই সে পথে সে প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ সেনাপতিদের আগমনবার্তা শোনা যেতে লাগল। রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'সাধনা' পত্রিকায় একদিকে যেমন প্রাচীন তাম্রশাসন প্রভৃতি প্রকাশিত হচ্ছিল, অপরদিকে তেমনি অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের ইতিবৃত্ত নিয়েও আলোচনা চলছিল। ১৮৯৫ সালেই সাধনা পত্রিকায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০) মহাশয়ের 'সিরাজদ্দৌলা' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে (সাধনা, ১৩০২ ভাদ্র-কার্তিক)। অতঃপর সাধনার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী-সম্পাদিত ভারতী পত্রিকায় সিরাজদ্দৌলা ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। সিরাজদ্দৌলা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ সালে। এই গ্রন্থের সমালোচনা করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ (ভারতী, ১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ এবং শ্রাবণ)। এই প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে এক স্থানে তিনি বলেছেন, "বাঙ্গালা ইতিহাসে তিনি যে স্বাধীনতার যুগ প্রবর্তন করিয়াছেন সেজন্য বঙ্গসাহিত্যে ধন্য হইয়া থাকিবেন" (ভারতী, ১৩০৫ শ্রাবণ, পৃ ৩৭০)। বাংলার ইতিহাসের এই যে দ্বারোদ্‌ঘাটন হল, সে দ্বারপথে অনতিবিলম্বেই আরও অনেকেই প্রবেশ করলেন। এঁদের মধ্যে বাংলার 'নবাবী আমল'এর ইতিহাস (১৩০৮) -রচয়িতা কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী' (১৩০৪) এবং 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস' (১৩০৯) রচয়িতা নিখিলনাথ রায়ের

নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সম্ভবতঃ বাংলার ইতিহাস রচনায় নবযুগ প্রবর্তনের ক্ষেত্রে প্রথম সেনাপতির মর্যাদা অক্ষয়কুমারেরই প্রাপ্য। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের বিশেষ বন্ধুতা ছিল।[১] এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারকে উপলক্ষ্য করে দেশের ইতিহাস সংকলনে যে প্রেরণা ও উৎসাহ জুগিয়েছিলেন তা বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। সিরাজদ্দৌলা গ্রন্থের সমালোচনার কথা একটু আগেই বলা হয়েছে। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় ১৮৯৯ সালে রাজসাহি থেকে 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাখানি দীর্ঘজীবী হয়নি বটে, কিন্তু সে তার স্বল্পকালীন প্রকাশের দ্বারাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে গেল যে, বাঙালির মনে বাংলার ইতিহাস সংকলনের ঐকান্তিক আগ্রহ দেখা দিয়েছে, বঙ্কিমনির্মিত পথে ইতিহাস-সেনাপতিদের পদধ্বনি শোনা যাবার আর বিলম্ব নেই। ঐতিহাসিক চিত্র প্রকাশের পূর্বেই তার আবির্ভাব-সম্ভাবনাকে উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের ইতিহাস উদ্ধারের

১ এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত ভারতী পত্রিকার একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন অক্ষয়কুমার। শুধু তাই নয়, উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় 'প্রসঙ্গকথা' রচনায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুক্তভাবেই অক্ষয়কুমারের নামোল্লেখ দেখা যায় অন্ততঃ একবার (ভারতী, ১৩০৫ আষাঢ়, পৃ ৩৫৬ ; সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)। অতঃপর রবীন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রথম বর্ষ (১৩০৮) থেকেই অক্ষয়কুমার ওই পত্রিকারও একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন।

সাধনাকে অভিনন্দন জানিয়ে ভারতী পত্রিকায় এক দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। এই প্রবন্ধে তিনি যে সব সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করলেন, আজও তা সশ্রদ্ধ স্মরণীয়তার সীমা অতিক্রম করে যায়নি। তিনি বললেন—

বাঙ্গলা দেশে আজকাল ইতিহাসের চর্চা বিশেষরূপে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব বিক্ষিপ্ত উদ্যমগুলিকে একত্র করিয়া একখানি ঐতিহাসিক পত্র বাহির করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। উপযুক্ত সম্পাদক উপযুক্ত সময়ে একার্যে অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা আমাদের আনন্দের বিষয়।...

আমাদের বিশেষ আনন্দের কারণ এই যে, সম্প্রতি বঙ্গ-সাহিত্যে যে একটি ইতিহাস-উৎসাহ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে সার্বজনীন সুলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে।...আজকাল সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে শিক্ষা এবং আন্দোলনের যে জীবনশক্তি নানা আকারে কার্য করিতেছে, এই ইতিহাসক্ষুধা তাহারই একটি স্বাভাবিক ফল।...

দেশব্যাপী বৃহৎ হৃৎস্পন্দন কিছুদিন হইতে আমরা যেন অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছি।...এখন আমরা বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাবকে যেমন নিকটে পাইতে চাই, তেমনি অতীত ভারতবর্ষকেও প্রত্যক্ষ করিতে চাহি। নিজের সম্বন্ধে সচেতন হইয়া এক্ষণে আমরা দেশে এবং কালে এক রূপে এবং বিরাট্ রূপে আপনাকে উপলব্ধি করিতে উৎসুক। এখন আমরা মোগল রাজত্বের মধ্য দিয়া পাঠান রাজত্ব ভেদ করিয়া সেনবংশ পালবংশ

গুপ্তবংশের জটিল অরণ্য মধ্যে পথ করিয়া পৌরাণিক কাল হইতে বৌদ্ধ কাল এবং বৌদ্ধ কাল হইতে বৈদিক কাল পর্যন্ত অখণ্ড আপনার অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছি। সেই মহৎ আবিষ্কার ব্যাপারের নৌযাত্রায় 'ঐতিহাসিক চিত্র' একটি অন্যতম তরণী। যে সকল নির্ভীক নাবিক ইহাতে সমবেত হইয়াছেন, ঈশ্বর তাঁহাদের আশীর্বাদ করুন, দেশের লোক তাঁহাদের সহায় হউন এবং বাধাবিঘ্ন ও নিরুৎসাহের মধ্যে অনুরাগপ্রবৃত্ত মহৎ কর্তব্য সাধনের নিষ্কাম আনন্দ তাঁহাদিগকে ক্ষণকালের জন্য পরিত্যাগ না করুক।...

আমাদের ইতিহাসকে আমরা পরের হাত হইতে উদ্ধার করিব, আমাদের ভারতবর্ষকে আমরা স্বাধীন দৃষ্টিতে দেখিব, সেই আনন্দের দিন আসিয়াছে।...'ঐতিহাসিক চিত্র' ভারত ইতিহাসের বন্ধনমোচন জন্য ধর্মযুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত। আশা করি ধর্ম তাহার সহায় হইয়া তাহাকে রক্ষা ও তাহার উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন করিবেন। অথবা

ধর্মযুদ্ধে মৃতো বা তেন লোকত্রয়ং জিতম্।

—ভারতী, ১৩০৫ ভাদ্র, পৃঃ ৪৬৭-৭৭

স্বদেশের ইতিহাস-উদ্ধার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিকতা কত গভীর এবং তাঁর আকাঙ্ক্ষার বেগ কত তীব্র, তা উদ্‌ধৃত অংশটুকুতে সুস্পষ্ট। অক্ষয়কুমারের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক চিত্রের প্রথম সংখ্যার প্রথমেই একটি 'সূচনা'ও লিখে দিয়েছিলেন। তাতে বলেছিলেন—

অদ্য ঐতিহাসিক চিত্রের শুভ জন্মদিনে আমরা যে আনন্দ করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা কেবলমাত্র সাহিত্যের উন্নতি সাধনের আশ্বাসে নহে, তাহার আরও একটি বিশেষ কারণ আছে।...

স্বদেশের ইতিহাস নিজেরা সংগ্রহ এবং রচনা করিবার যে উদ্‌যোগ, সেই উদ্‌যোগের ফল কেবল পাণ্ডিত্য নহে। তাহাতে আমদের দেশের মানসিক বদ্ধজলাশয়ে স্রোতের সঞ্চার করিয়া দেয়। সেই উদ্যমে সেই চেষ্টায় আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের প্রাণ।

বঙ্গদর্শনের প্রথম অভ্যুদয়ে বাঙ্গালা দেশের মধ্যে একটি অভূতপূর্ব আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইয়াছিল, একটি সুদূরব্যাপী চাঞ্চল্যে বাঙ্গালার পাঠকহৃদয় যেন কল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে আনন্দ স্বাধীন চেষ্টার আনন্দ।....

বঙ্গদর্শন আমাদের সাহিত্যপ্রাসাদের বড় সিংহদ্বারটা খুলিয়া দিয়াছিলেন। এখন আবার তাহার এক-একটি মহলের চাবি খুলিবার সময় আসিয়াছে। ঐতিহাসিক চিত্র অদ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস নামক একটা প্রকাণ্ড রুদ্ধবাতায়ন হর্ম্যশ্রেণীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান।...

আশা করি যে, এই পত্র আমাদের দেশে ঐতিহাসিক স্বাধীন চেষ্টার প্রবর্তন করিবে।...সেই চেষ্টাকে জন্ম দিয়া যদি ঐতিহাসিক চিত্রের মৃত্যু হয়, তথাপি সে অমর হইয়া থাকিবে।

—সূচনা, ঐতিহাসিকচিত্র, প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড

ধর্মযুদ্ধেই ঐতিহাসিক চিত্রের মৃত্যু হয়েছে, তথাপি সে লোকত্রয় জয় করে অমর হয়েছে। কিভাবে তার দ্বারা লোকত্রয় বিজিত হয়েছে, পরবর্তী আলোচনা থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। ইদানীং কালে (১৯৫০) বঙ্গীয় ইতিহাসপরিষদ্ 'ইতিহাস' নামে যে ত্রৈমাসিক পত্র প্রকাশ করেছেন, অর্ধ শতাব্দীরও পূর্বে ঐতিহাসিক চিত্রই তার পথনির্মাণে ব্রতী হয়েছিল, একথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত-রচয়িতা শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অভিমতও উদ্ধৃতিযোগ্য।—

সাহিত্যেও যেমন ইতিহাসের ক্ষেত্রেও বাংলা দেশে তেমনি আত্মপ্রকাশের চেষ্টা চলিতেছিল। ইহার সূত্রপাত করেন পরলোকগত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রস্তাবে তিনি 'ঐতিহাসিক চিত্র' প্রকাশ করেন। এই সময়ে তাঁহার অমর গ্রন্থ 'সিরাজদ্দৌলা' বাহির হয়। বাংলা ভাষায় বাঙালির ঐতিহাসিক গবেষণা—যে গবেষণা তাহার জাতীয় আত্মকর্তৃত্বের সহায়তা করিয়াছে—তাহার সূত্রপাত এইখানে। রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের এই গ্রন্থকে বিস্তৃতভাবে সমালোচনা করিয়া বঙ্গ-সমাজে সুপরিচিত করেন।

—রবীন্দ্রজীবনী ২য় সং, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৫৫

ঐতিহাসিক চিত্রের প্রকাশকালে (১৮৯৯) রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তও যে তৎকালীন ঐতিহাসিক চেতনার প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ পাই তাঁর 'কথা' কাব্যে। উক্ত

গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই যে ১৮৯৯ সালের রচনা তা নিতান্তই আকস্মিক ঘটনা নয়। কথা কাব্যের সব কবিতাই কোনো না কোনো ঐতিহাসিক সূত্র অবলম্বনে রচিত, এটাই সব চেয়ে বড় কথা নয়। ভারতবর্ষের বহু প্রদেশ ও ভারত-ইতিহাসের বহু যুগের ইতিহাস এই গ্রন্থের উপাদান জুগিয়েছে। সবগুলি কবিতাকে একত্র করে দেখলেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টিও দেশে এবং কালে কত দূরপ্রসারী ছিল। কথা কাব্য ও ঐতিহাসিক চিত্রের মধ্যে যে একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্র বিদ্যমান ছিল তার একটি পরোক্ষ প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে। উক্ত ঐতিহাসিক পত্রিকায় 'চাঁদ কবির বীরগাথা' নামে একটি প্রবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধের প্রথম কিস্তির শেষে এইরূপ 'মন্তব্য' ছিল।—

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় চাঁদ কবির বীরগাথা বাঙ্গলায় কবিতানিবদ্ধ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন; তাহা যথাকালে প্রকাশিত হইবে।

—ঐতিহাসিক চিত্র, প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড

সম্ভবতঃ এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে চাঁদ কবির বীরগাথার বাংলা পদ্যানুবাদের অবসর ঘটেনি। ঐতিহাসিক চিত্রও এক বৎসরের অধিক চলেনি।

বাংলা সাহিত্যের এক পর্বে ইতিহাস সংকলনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রেরণা দিয়েছিলেন, তার পরবর্তী পর্বে তাতে শক্তি জোগালেন রবীন্দ্রনাথ। ঐতিহাসিক চিত্রে এই দুই সাহিত্যরথীর

ইতিহাস-প্রেরণার একত্র সমাবেশ ঘটেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণা তখনও কতখানি সক্রিয় ছিল তার পরিচয় আছে উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবেদনে। আর, তার 'সূচনা' অংশে রবীন্দ্রনাথের শক্তিমন্ত্র উচ্চারণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

৮

ইতিহাস-সাধনার ধারা

উনবিংশ শতকের শেষদিকে বাংলাদেশে এই যে ঐতিহাসিক চেতনার জোয়ার দেখা দিল তার পলিস্তর বাঙালির মনকে কতখানি উর্বরতা দান করেছিল, পরবর্তিকালীন ফসলের প্রাচুর্যেই তার যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে। এই ফসলপ্রাপ্তির সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুকাল (১৮৯৪) থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বছরের মধ্যে বাঙালির পুরাবৃত্তসাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে হলে এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত প্রধান প্রধান গ্রন্থ এবং ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান ও প্রচেষ্টার একটা মোটামুটি বিবরণ দেওয়াই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

পূর্বে বলেছি বাঙালির জাতীয় জীবনের প্রধান কীর্তি সাহিত্যসৃষ্টি। সুতরাং বাঙালির ইতিহাস বলতে তার সাহিত্যের ইতিহাসকে বাদ দেওয়া যায় না। বস্তুতঃ বাঙালির সাধারণ ইতিহাস রচনার পূর্বেই যে তার সাহিত্যের ইতিহাস রচিত হয়েছিল তাও তাৎপর্যহীন নয়। এই প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-

-রচয়িতা দীনেশচন্দ্র সেনের (১৮৬৬-১৯৩৯) নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর আগে যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার চেষ্টা হয়নি তা নয়। এক হিসাবে বলা যায়, বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিবৃত্তকার হচ্ছেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯)। তাঁর সংকলিত রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র ও অন্যান্য কবিদের জীবনী ও রচনাবলীর কথা শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণযোগ্য। অতঃপর দীনেশ-চন্দ্রের পূর্বগামীদের মধ্যে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় (কবিচরিত ১৮৬৯), বঙ্কিমচন্দ্র (**Bengali Literature** ১৮৭১), মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (বঙ্গভাষার ইতিহাস ১৮৭১), রামগতি ন্যায়রত্ন (বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব ১৮৭২-৭৩, দ্বিতীয় সং ১৮৮৭), রাজনারায়ণ বসু (বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা ১৮৭৬, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৮৭৮) এবং রমেশচন্দ্র দত্ত (**The Literature of Bengal** ১৮৭৭; দ্বিতীয় সং ১৮৯৫), এই কয়জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এঁদের প্রত্যেকেরই দৃষ্টিভঙ্গির স্বকীয় বিশিষ্টতা আছে এবং উক্ত গ্রন্থগুলির উপযোগিতা আজও সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়নি। তার মধ্যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গ্রন্থখানির মূল্যবত্তা আজও স্বীকৃত; অপর তিনজনের বইগুলির কথা প্রায় বিস্মৃত। দীনেশচন্দ্রও ১৮৯১ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৮৯৬ সালে তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশের ফলেই বাঙালি-মনের তৎকালীন চেতনাস্রোতে একটি নূতন

প্রবাহের সংযোগ ঘটল। বস্তুতঃ বাংলার সাধারণ ইতিবৃত্তচর্চার ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের যে স্থান, বাংলার সাহিত্যিক ইতিবৃত্তের ক্ষেত্রে দীনেশচন্দ্রেরও সেই স্থান। এই ইতিবৃত্তসাধনার জন্য দীনেশচন্দ্রও অক্ষয়কুমারের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন ও বন্ধুতা লাভ করেছিলেন। অক্ষয়কুমার ও দীনেশচন্দ্রের সাধনার এই দুটি ধারাই পরবর্তী কালে বাঙালির ইতিহাসকে সম্পূর্ণতা দানের দিকে প্রবল গতিতে অগ্রসর হয়েছে। উক্ত দুই ধারায় আজ পর্যন্ত যে-সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিলেই একথার সার্থকতা প্রতিপন্ন হবে। প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থরচনা ছাড়া অন্যবিধ ঐতিহাসিক প্রচেষ্টারও কিছু পরিচয় দেওয়া গেল।

১৮৯৪—বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর (৮ এপ্রিল) প্রায় অব্যবহিত পরেই (২৯ এপ্রিল) প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ। এই পরিষদের প্রচেষ্টায় বাংলার ইতিহাস রচনার কতখানি সহায়তা হয়েছে তার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে পরিষৎ-পত্রিকায়, পরিষৎ-প্রকাশিত গ্রন্থসমূহে এবং তার প্রত্নসংগ্রহশালায়।

১৮৯৫—**The Literature of Bengal** (দ্বিতীয় সং): রমেশচন্দ্র দত্ত

রমেশচন্দ্র ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের প্রথম সভাপতি (১৮৯৪) এবং সাহিত্য-নায়কতায় বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকারী। তদুপরি তিনি একাধারে প্রথম স্তরের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক।

তাঁর রচিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যে তাঁর বিশিষ্ট চিন্তার ছাপ বহন করবে তা বিচিত্র নয়। তাঁর নাতিক্ষুদ্র পুস্তকখানি (২১০ পৃষ্ঠা) প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ সালে। কিন্তু তখন বইটি **Ar Cy Dae** এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। বইটি তিনি উৎসর্গ করেন তাঁর খুল্লতাত এবং **Bengal** নামক ইতিহাস-গ্রন্থের (১৮৭৪, 'অনুষঙ্গ' অংশে বর্ণিতব্য) রচয়িতা শশীচন্দ্র দত্তকে। বইটির (সচিত্র) দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ সালে এবং গ্রন্থকারের স্বনামে। এই সংস্করণে বইটি বহুলপরিমাণে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়।

বাংলা সাহিত্যের এই ইতিহাসখানিতে কোনো নবাবিষ্কৃত তথ্য বা কোনো সমস্যার নূতন মীমাংসা নেই। কিন্তু যথার্থ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় এই গ্রন্থটিতেই। এই হিসাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নামধেয় পুস্তকাবলীর মধ্যে এটির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। জাতীয়তার আদর্শের দ্বারা প্রণোদিত হয়েই রমেশচন্দ্র এই পুস্তকখানিতে শুধু বাংলা সাহিত্যের নয়, পরন্তু বাংলার জাতীয় জীবনেরই ইতিহাস চিত্রিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। রমেশচন্দ্রের অভিমতে—"**The literature of every country, slowly expanding through successive ages, reflects accurately the manners and customs, the doings, and the thoughts of the people. And thus, alltough no works of a purely historical charac-**

ter has been left behind by the people of ancient India, it is possible to gain from their works on literature and religion a fairly accurate idea of their civilisation and the progress of their intellect and social institutions"। এস্থলে বলা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের মতেও সংস্কৃত তথা বাংলা সাহিত্যের সার্থকতা এখানেই। এই আদর্শের প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে রমেশচন্দ্র এই গ্রন্থে চেষ্টা করেছেন—**to trace as far as possible the history of the people, as reflected in the literature of Bengal**। এই বইতে বাংলা সাহিত্যের যথার্থ স্বরূপ, তার গতি ও প্রকৃতির চিত্র বাহুল্যহীন স্পষ্টরেখায় অঙ্কিত তো হয়েছেই, অধিকন্তু বাংলার জাতীয় জীবনের অন্তঃপ্রকৃতিকেও (**the inner life, the thoughts, the feelings, the real life of Bengal**) পাঠকের সম্মুখে স্বরূপে উপস্থাপিত করেছেন। সুতরাং বইখানিকে একাধারে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি জাতির ইতিহাস বলেই গণ্য করা যায়। এই বইখানির প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্রের চটি বাংলার ইতিহাস (১৮৯২) বইটিও স্মরণীয়। এই দুখানি বই একসঙ্গে বাংলার সর্বাঙ্গীণ ইতিহাসকে সমগ্ররূপে ধারণা করতে অনেকখানি সহায়তা করে। রমেশচন্দ্রের অন্যান্য অনেক গ্রন্থের ন্যায় **Literature of Bengal** বইটিরও একটি নূতন সংস্করণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১৮৯৬—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য : দীনেশচন্দ্র সেন।

এই বই পড়ে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থকারকে অভিনন্দন জানিয়ে যে পত্র লিখেছিলেন, দীনেশচন্দ্র তাঁর 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' পুস্তকে তার উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া এই গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন-প্রণীত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' এই শ্রেণীর বাঙ্গালা পুস্তকের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে" (ভারতী, ১৩০৫ বৈশাখ, পৃ ৭৪)।

১৮৯৭—সিরাজদ্দৌলা : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

এই গ্রন্থের রবীন্দ্রকৃত সমালোচনার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এখানে অধিকতর পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

১৮৯৯—ঐতিহাসিক চিত্র : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-সম্পাদিত।

এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানির গুরুত্বের বিষয়ও পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। পত্রিকাখানি দীর্ঘকাল চলেনি বটে, কিন্তু যে আদর্শ ও অভিপ্রায় নিয়ে এটি প্রকাশিত হয়েছিল তা আজও আমাদের পক্ষে অনুসরণীয় হয়ে রয়েছে।

১৮৯৯—বাঙ্গালার ইতিহাস : রজনীকান্ত গুপ্ত।

বিদ্যালয়পাঠ্য ক্ষুদ্রায়তন পুস্তক হলেও এখানি বর্তমান তালিকায় উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতকের চতুর্থ দশক থেকেই আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে বাংলার ইতিহাস পাঠ্য বিষয় বলে স্বীকৃত ছিল। ফলে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত 'প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৭৪) প্রকাশের বহু পূর্ব থেকেই এই জাতীয় অজস্র পুস্তক নিত্যই রচিত ও প্রকাশিত হচ্ছিল। বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে সে-সব বৈশিষ্ট্যহীন পুস্তকের ইতিহাস

উদ্ধারের কোনো সার্থকতা নেই। কিন্তু প্রখ্যাতনামা ঐতিহাসিকের রচনা হিসাবে রাজকৃষ্ণের পুস্তকের ন্যায় রজনীকান্তের পুস্তকখানিও স্মরণযোগ্য। চিন্তাহীন গতানুগতিকতার ধারার মধ্যে এ দুখানি বই কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক দৃষ্টির বিশিষ্টতা সঞ্চার করতে পেরেছিল। তাই বাংলার ঐতিহাসিক সাহিত্যের বিবরণে এই ক্ষুদ্রকায় পুস্তকটি উপেক্ষিত হল না। এটিতে রমেশচন্দ্র দত্তের বাংলার ইতিহাস গ্রন্থের আদর্শ (একাদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিতব্য) কিছু পরিমাণে অনুসৃত হয়েছে। বইখানি হিন্দু মুসলমান ও ব্রিটিশ এই তিন যুগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক যুগের ইতিহাস পাঁচটি করে অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে। রজনীকান্তের বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯২০) একখানি বই আমার কাছে আছে। এই সংস্করণে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত ইতিহাস পাওয়া যায়।

১৯০১—বাঙ্গালার ইতিহাস, নবাবী আমল : কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই বৃহৎ গ্রন্থে (৫৫০ পৃষ্ঠা) অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভ থেকে ইংরেজের দেওয়ানি প্রাপ্তি (১৭৬৫) পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এই সময়টা একটা যুগান্তকারী বিপ্লবের যুগ। নানা বৈপ্লবিক ঘটনাপরম্পরার পরিণামে কি ভাবে "বাঙ্গালী মুসলমান নবাবের দুর্বল হস্তের রাজদণ্ড দক্ষতর পাশ্চাত্য বণিকের তুলাদণ্ডে পরিণত হইয়াছিল" তাও এই গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিঞ্চিদধিক অর্ধশতাব্দী কালের বিপর্যয়বহুল জটিল

ঘটনাচক্রের আবর্তনে মথিত বাংলার যে পুরাচিত্র এই গ্রন্থে অঙ্কিত হয়েছে তা আজও সম্পূর্ণ মলিন হয়ে যায়নি। ঘটনার বাহুল্যে ও বৈচিত্র্যে এযুগের ইতিহাস যেমন বিস্ময়কর, এই গ্রন্থের বিষয়বিন্যাস, বর্ণনাভঙ্গি এবং ভাষার সংযত শক্তিও তেমনি প্রশংসনীয়। একদিকে অনন্যসাধারণ তথ্যবহুলতা এবং অপরদিকে ভাষার সাহিত্যসুলভ হৃদয়গ্রাহিতা এই গ্রন্থখানিকে যথার্থ ইতিহাস-সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। বাঙালির পুরাবৃত্তসাধনার প্রথম যুগে রচিত এই বইটি বাংলার অন্যতম প্রধান গ্রন্থ বলে স্বীকৃত হবার যোগ্য। এর প্রথম উনিশ অধ্যায়ে আছে রাষ্ট্রীয় উত্থানপতনের বিচিত্র বিবরণ এবং শেষ দুই অধ্যায়ে রাজকীয় শাসনপ্রণালী ও দেশের সাধারণ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এই শেষ দুটি অধ্যায়ের দ্বারা অনেক পরিমাণে পুস্তকখানির মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। নবাবদের ছবি এবং বাংলার মানচিত্র দেওয়াতেও গ্রন্থের মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, পঞ্চাশ বছর আগে এই বইখানির যে উপযোগিতা ছিল আজ আর তা নেই। নূতন তথ্যের আবিষ্কার এবং ঐতিহাসিক বিচারপদ্ধতির বিবর্তনের ফলে আধুনিককালে বাংলার নবাবী আমলের ইতিহাস অনেকাংশেই নূতন রূপে গঠিত হয়েছে। তথাপি আলোচ্যমান গ্রন্থখনির মূল্য অস্বীকার করবার কোনো কারণ নেই। ঐতিহাসিক আলোচনার বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হবার পথ বহুল পরিমাণে সুগম হয়েছে এই গ্রন্থের দ্বারাই। গ্রন্থখানি প্রকাশিত হবার অল্পকাল পরেই এটির একটি

সুচিন্তিত সমালোচনা প্রকাশিত হয় রবীন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রথম বর্ষের অষ্টম-সংখ্যায়। সমালোচনা করেছিলেন তৎকালীন ইতিহাস-সারথি অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। এই বইটি সম্বন্ধে তিনি যা বলেছিলেন আজও তা স্মরণ করবার সার্থকতা আছে। একটু বিস্তৃতভাবেই তাঁর উক্তি উদ্‌ধৃত করছি।—

বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, ইহা নূতন কথা না হইলেও বাঙালীর কলঙ্কের কথা। যাঁহারা এই কলঙ্ক দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের শ্রম সফল হইলে তদ্‌দ্বারা বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগ প্রবর্তিত হইবে।···

স্বাধীনভাবে তথ্যানুসন্ধান করিয়া স্বদেশের সুসংকলিত ইতিহাস প্রচার করা যে বঙ্গসাহিত্য-সেবকগণের কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত তাহা বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে বিঘোষিত করেন। তাহার প্রথম ফল স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-কৃত শিশুপাঠ্য বাঙ্গালার ইতিহাস। সেই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, তাহা 'মুষ্টিভিক্ষামাত্র, কিন্তু সুবর্ণমুষ্টি'। তথাপি বঙ্গসাহিত্যের ঐতিহাসিক বিভাগে স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়কেই স্বাধীন অনুসন্ধিৎসার পথপ্রদর্শক বলিতে হইবে।····

বাঙ্গালার সুবিস্তৃত ইতিহাস প্রচারের ইহাই প্রথম উদ্যম।... বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস তাঁহার অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অপরিসীম পরিশ্রমের কীর্তিস্তম্ভরূপে চিরকাল সমাদর লাভ করিবে। পরবর্তী ইতিহাস-লেখকগণ

যে ইহা হইতে কত উপকার লাভ করিবেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।...মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শিশুপাঠ্য সরল ইতিহাস 'সুবর্ণমুষ্টি', বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রৌঢ়পাঠ্য জটিল গ্রন্থ 'সুবর্ণস্তূপ'। শিল্পনিপুণ অধ্যবসায়শীল পরবর্তী লেখকগণ এই স্তূপ হইতে সুবর্ণ সংগ্রহ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের সর্বাঙ্গে বহু রত্নালংকার সংযুক্ত করিতে পারিবেন। আকরোত্থিত ধাতুপিণ্ডের সহিত অনেক অসার আবর্জনা মিশ্রিত থাকিলেও তাহার মূল্য নষ্ট হয় না; বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐতিহাসিক সুবর্ণস্তূপের সহিত অনেক অসংগত মতামত সংযুক্ত হইয়াছে বলিয়া তাহারও মূল্য নষ্ট হইবে না। বরং বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় তথ্যানুসন্ধাননিপুণ অধ্যবসায়শীল লেখক ঐতিহাসিক পাত্রমিত্র-গণের প্রকৃত মর্যাদা নিরূপণের পথ সহজ করিয়া দিলেন। লোকে এখন তাঁহার মতামতের সহিত অন্যান্য মতামত তুলনায় সমালোচনা করিয়া সহজে তথ্যনির্ণয় করিতে সক্ষম হইবে।...

ত্রুটি এবং মতভেদ থাকিলেও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস বৃত্তান্তসংকলনগৌরবে বঙ্গসাহিত্যের অতি উচ্চস্থান অধিকার করিবার যোগ্য হইয়াছে।...নবাবী আমলের প্রায় সকল কথাই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সকল বৃত্তান্ত যে-সকল পুরাতন প্রচলিত-অপ্রচলিত গ্রন্থাদি হইতে সংকলিত, তাহারও পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহারা বাঙ্গালার ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধান-কার্যে ব্যাপৃত হইবেন তাঁহাদের শ্রম যে এতদ্দ্বারা অনেক

পরিমাণে সহজ হইয়া আসিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপভাবে বৃত্তান্তসংকলন করিয়া স্বদেশের ইতিহাস রচনার চেষ্টা অতি অল্পদিনমাত্র আরব্ধ হইয়াছে; কালে এইরূপ চেষ্টা হইতেই ইতিহাস সুগঠিত হইবে।

১৯০১—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য: দীনেশচন্দ্র সেন, দ্বিতীয় সংস্করণ।

এই সংস্করণ প্রকাশের পরেই বাংলার সাহিত্যগত ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙালির মন বিশেষভাবে সচেতন হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ এবারে বঙ্গদর্শনে এই পুস্তকের আর-একটি সমালোচনা প্রকাশ করেন এবং এই উপলক্ষ্যে বাংলার মনোজগতের যথার্থ ইতিহাসের পরিচয় দিতে চেষ্টা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন,—

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ যখন বাহির হইয়াছিল তখন দীনেশবাবু আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বলিয়া এত বড় একটা ব্যাপার যে আছে তাহা আমরা জানিতাম না, তখন সেই অপরিচিতের সঙ্গে পরিচয়-স্থাপনেই ব্যস্ত ছিলাম। দ্বিতীয় বার পাঠে গ্রন্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার সময় ও সুযোগ পাইয়াছি।...আমরা দীনেশবাবুর গ্রন্থের মধ্যে বাংলাদেশের বিচিত্রশাখাপ্রশাখাসম্পন্ন ইতিহাসবনস্পতির বৃহৎ আভাস দেখিতে পাইয়াছি।...যে সকল প্রলয়শক্তি ও সৃজনশক্তি অদৃশ্যভাবে সমাজকে পরিণতি দান করিয়া আসিয়াছে, সাহিত্যের স্তরে স্তরে তাহাদের ইতিবৃত্ত

আপনি মুদ্রিত হইয়া যায়। সেই নিগূঢ় ইতিহাসটি উদ্‌ঘাটন করিতে পারিলে প্রকৃতভাবে সজীবভাবে আমাদের দেশকে আমরা জানিতে পারি।

১৯০১—**India of Aurangzib :** যদুনাথ সরকার।

এই গ্রন্থটি রচনা করেই যদুনাথ ১৮৯৭ সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। তার চার বৎসর পরে এটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি প্রত্যক্ষতঃ বাংলার ইতিহাস-বিষয়ক নয়। কিন্তু এই সময় থেকেই বাঙালির ইতিবৃত্ত-সাধনার ক্ষেত্রে একজন মহাসেনাপতির আবির্ভাব ঘটল। তাই এস্থলে এই গ্রন্থটির উল্লেখ সমীচীন মনে করলাম।

১৯০৩—বাঙ্গালার ইতিহাস (তৃতীয় ভাগ): ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম ভাগ (১৮৫৯), সেনবংশের সময় থেকে আলিবর্দির শাসনকাল পর্যন্ত, রামগতি ন্যায়রত্ন-প্রণীত। দ্বিতীয় ভাগ (১৮৪৮) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-কৃত। তাতে আলিবর্দির পর থেকে বেন্টিঙ্কের অধিকারকালের শেষ (১৮৩৫) পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস পাওয়া যায়। এই দুখানি বই-ই মার্শম্যানের ইংরেজি **History of Bengal** (১৮৩৯) অবলম্বনে রচিত। অতঃপর ভূদেব বেন্টিঙ্কের পরবর্তী কাল থেকে বাংলার ছোটলাট লর্ড বীডনের (১৮৬২-৬৭) শাসনকাল পর্যন্ত বাংলার ইতিবৃত্ত সংকলন করেন। এই সংকলন মূলতঃ তাঁর স্বাধীন চেষ্টা ও চিন্তার ফল। গ্রন্থবর্ণিত ঘটনাবলীও তাঁর

নিজের জীবনকালেই (১৮২৭-৯৪) সংঘটিত হয়েছিল এবং অনেকাংশেই তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় ছিল। এই হিসাবে এই ক্ষুদ্র বইখানির (১৫৬ পৃষ্ঠা মাত্র) একটি বিশেষ মূল্য আছে। বইটি যথাকালে প্রকাশিত হয়নি, হয়েছিল গ্রন্থকারের মৃত্যুর বেশ কিছুকাল পরে। যথাকালে প্রকাশিত না হবার কোনো বিশেষ কারণ ছিল কিনা জানি না। বাঙ্গালার ইতিহাস তৃতীয় ভাগের প্রথমাংশ 'শিক্ষাদর্পণে' ও শেষাংশ 'এডুকেশন গেজেটে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল (১৮৬৫-৬৯)।

১৯০৪—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী।

বইখানি মুলতঃ রামতনু লাহিড়ীর জীবনচরিত হিসাবে লিখিত হলেও আধুনিক কালে এই বইএর প্রধান মূল্য ইতিহাস হিসাবেই। গ্রন্থকার নিজেও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতেই তিনি লেখেন, "তাঁহার জীবনচরিত লিখিতে গেলে বঙ্গদেশের আভন্ত্যরীণ ইতিবৃত্তকে বাদ দিয়া লেখা যায় না। তাই বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীণ সামাজিক ইতিবৃত্তের বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হইতে হইল।" দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯০৯) ভূমিকায় তাঁর উক্তি আরও সুস্পষ্ট। "মনে এই একটা সন্তোষ রহিল যে, বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তের কয়েক অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়ের কিয়দংশ রাখিয়া গেলাম; এবং যে সকল মানুষ জন্মিয়া বঙ্গদেশকে লোকচক্ষে উন্নত করিয়াছেন তাঁহাদের জীবনের স্থূল স্থূল কথা রাখিয়া গেলাম।"

রামতনুর জীবনকালকে (১৮১৩-১৮৯৮) অবলম্বন করে শিবনাথ বাঙালির জাতীয় জীবনের প্রায় এক শতাব্দী কালের ইতিহাস রচনা করেছেন। ওই শতাব্দী হচ্ছে বাংলার ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব গৌরবের যুগ। বাংলার দীর্ঘকালীন ইতিহাসে এমন সর্বতোমুখী অভ্যুদয় আর কখনও দেখা যায়নি। শিক্ষায় সাহিত্যে ধর্মে কর্মে সমাজসংস্কারে রাষ্ট্রীয় চেতনায় বাঙালির জাতীয় জীবনে যে জোয়ার এসেছিল তার তুলনা বিরল। এই গ্রন্থে উক্ত জাতীয় অভ্যুত্থানের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসই বিবৃত হয়েছে অতি বিশদ ও বলিষ্ঠ ভাষায়। গ্রন্থকার স্বয়ং এই জাতীয় আন্দোলনের অনেকাংশের সঙ্গেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুক্ত ছিলেন; এই ইতিহাসের বহু বিখ্যাত নায়কের কাছেই তিনি ছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত; এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত। এসব কারণে এই ইতিবৃত্তখানির একটি বিশেষ মূল্য আছে। গ্রন্থবর্ণিত বহু বিষয়ই লেখকের প্রত্যক্ষজ্ঞানলব্ধ। এই হিসাবে বইখানি বাংলার উনবিংশ শতকের ইতিহাসের উপাদান-পুস্তক রূপে স্বীকৃত হবার যোগ্য; সেদিক্ থেকে এই বইএর উপযোগিতা দীর্ঘকাল অব্যাহত থাকবে।

বলতে গেলে এখানি আধুনিক বাংলার প্রথম ও শেষ পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। এর পূর্বে বা পরে ঠিক এই ধরণের প্রামাণিক ও সর্বাঙ্গীণ গ্রন্থ আর লিখিত হয়নি। তবে একথা বলা বাহুল্য যে, আধুনিক কালে উনবিংশ শতকের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের

জ্ঞান অনেকখানি পূর্ণতা পেয়েছে এবং এই গ্রন্থের অনেক ত্রুটি ও ভুলভ্রান্তি জ্ঞানগোচর হয়েছে। আধুনিক জ্ঞানের আলোতে সে-সব ত্রুটিবিচ্যুতি ও অভাব মোচন করে নিয়ে বইখানির একটি সুসম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ করা আবশ্যক। তেমনি এই গ্রন্থবর্ণিত ঘটনাবলীর পর থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত জাতীয় জীবনের ইতিহাস নিয়ে অনুরূপ আর-একখানি পুস্তক প্রকাশ করা বিশেষ প্রয়োজন। তাহলে উনবিংশ শতকের গোড়া থেকে বিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলার অধুনিক গৌরবযুগের ইতিহাস বোঝা সহজ হবে।

রামতনু লাহিড়ীর চারিত্রিক মহত্ত্ব এবং তাঁর এই জীবনচরিতখানির সাহিত্যিক উৎকর্ষ, এই দুই গুণে আকৃষ্ট হয়ে কৃষ্ণনগর কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ও ইতিহাসাধ্যাপক লেথব্রিজ সাহেব বইটির একটি ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করেন (১৯০৭, দ্বিতীয় সং ১৯১৩)। ইংরেজি সংস্করণে বইটির নাম হয় **Ramtanu Lahiri : A History of the Renaissance in Bengal**। এই নাম থেকেই বইএর স্বরূপ স্পষ্ট বোঝা যায়। এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেথব্রিজ সাহেব লেখেন,—

The lifetime of Ramtanu Lahiri was synchronous with the renaissance of Bengali literature—the period of awakening in Bengal that saw also the birth and early growth of English education in the country, and of the various schools of reform in religion and morals that have so mightily changed the whole aspect of Bengali life and

thought. It was, therefore, fitting that one of the most important of the works that have yet appeared in pure Bengali should have been a "Life" of this great educationist and reformer, from the pen of Pandit Sivanath Sastri M. A., himself one of the most distinguished writers of modern Bengal. ...The Pandit's work is quite the most scholarly book of its kind, as well as the most serious and sustained effort to combine, in a biographical work, Oriental and Western modes of thought, that has yet appeared in Bengal.

বলা প্রয়োজন যে, লেথব্রিজ সাহেব শুধু যে দীর্ঘকাল বাংলা দেশে অবস্থান করেছিলেন তা নয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যও তিনি ভালো করেই অধিগত করেছিলেন।

এই বইখানির পরিপূরক হিসাবে এখানে শিবনাথের 'আত্মচরিত' (১৯১৮, দ্বিতীয় সং ১৯২০, তৃতীয় সং ১৯৪০) এবং History of the Brahmo Samaj দুই খণ্ড (১৯১১-১২) এবং শিবনাথের কন্যা হেমলতা দেবী-কৃত 'শিবনাথ-জীবনী', এই তিনখানি গ্রন্থও এস্থলে উল্লেখযোগ্য।

১৯০৪—ঐতিহাসিক চিত্র (দ্বিতীয় পর্যায়): নিখিলনাথ রায়-সম্পাদিত।

অক্ষয়কুমারের সম্পাদিত ঐতিহাসিক চিত্র উঠে যাবার পাঁচ বৎসর পরে তার দ্বিতীয় পর্যায় প্রকাশিত হয় নিখিলনাথের সম্পাদনায়। নামতঃ এক হলেও এই দ্বিতীয় পর্যায়ের আদর্শ ও লক্ষ্য প্রথম পর্যায় থেকে পৃথক্ ছিল। প্রথম পর্যায়ে মুখ্যতঃ

স্বাধীন অনুসন্ধান ও আলোচনার ফলাফলই প্রকাশিত হত। কিন্তু ওরকম ফলাফল সম্বন্ধে আগ্রহী পাঠকের সংখ্যা ছিল কম, এবং সাধারণের মধ্যে ঐতিহাসিক চেতনা ছিল দুর্বল। তাই কাগজখানি এক বছর পরেই উঠে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের লক্ষ্য ছিল সর্ববিধ ঐতিহাসিক জ্ঞান পরিবেশনের দ্বারা "সাধারণের মনোরঞ্জন"। "কেবল স্বদেশীয় নহে, বিদেশীয় ইতিহাস-আলোচনাও উন্নতির পক্ষে সহায়তা করিয়া থাকে। সেইজন্য ঐতিহাসিক চিত্র জাতীয় ও বিজাতীয় উভয়বিধ ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া জনসাধারণের, বিশেষতঃ ছাত্রগণের, মধ্যে ইতিহাস-আলোচনার সাহায্য করিতে চেষ্টা করিবে। সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান সময়ের ঐতিহাসিক সংবাদও প্রকাশিত হইবে।" এই উদ্দেশ্য-বিবৃতির প্রসঙ্গে নব পর্যায়ের প্রথম সংখ্যাতে দেশের তৎকালীন ইতিহাস-চেতনা সম্বন্ধে যে-সব উক্তি করা হয়েছে, তা উদ্‌ধৃতিযোগ্য।—

আজকাল বঙ্গদেশে ধীরে ধীরে ইতিহাস-আলোচনার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। কি সাহিত্যজগৎ, কি নাট্যজগৎ, সর্বত্রই ইতিহাসের সমাদর দেখা যাইতেছে। বঙ্গবাসিগণ যে ক্রমে ক্রমে ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন, ইহা দেশের শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে।...যে বাঙ্গালী জগতের সমক্ষে হেয় বলিয়া পরিচিত, তাহারও অতীত কাহিনীর অভাব নাই। বর্তমান সময়ে নানা দিক্ হইতে তাহার অনুসন্ধান আরব্ধ হইয়াছে। তাই এই ঐতিহাসিক যুগে জনসাধারণের—বিশেষতঃ

ভবিষ্যতের আশাস্থল ছাত্রবৃন্দের নিকট ঐতিহাসিক কথা প্রচারের জন্য ঐতিহাসিক চিত্রের অবতারণা ॥

কিন্তু প্রথম পর্যায়ের মতো দ্বিতীয় পর্যায়ও এক বছরের বেশি স্থায়ী হয়নি। কিন্তু তিন বছর পরেই তার পুনরুজ্জীবন ঘটে।

১৯০৪—**History of Bengal : Charles Stewart** (বঙ্গবাসী সংস্করণ)।

এই সংস্করণে বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনের প্রয়াস নেই, কিন্তু বাংলার নবজাগ্রত ইতিহাস-চেতনা ও ঐতিহাসিক জ্ঞান বিস্তারের প্রয়াস আছে। এই সংস্করণের ভূমিকায় বলা হয়েছে— **Stewart's History of Bengal is not only the best but is also the first work that was ever written on the subject. Ninety years have passed since this book was first published...Major Stewart's History of Bengal still holds the ground as the standard work on the subject**। ওই ভূমিকা থেকেই জানা যায় তৎকালে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের ফলে শিক্ষিত সমাজের মনে স্বদেশের ইতিহাস জানার তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয় এবং ইতিহাসহীনতার কলঙ্ক অনেকের কাছেই পীড়াদায়ক বলে গণ্য হচ্ছিল। ফলে স্বদেশের ইতিহাস জানা ও নূতন করে গড়বার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। **"Signs are now visible on all sides to show that they are becoming fully alive to this deficiency, and many**

of them have now commenced not only to study the works already existing on the subject, but also to throw additional light upon it by careful enquiry and original research.” এই নবোদ্বুদ্ধ ইতিহাস-জিজ্ঞাসার পরিতৃপ্তির উপাদান জোগাবার উদ্দেশ্যেই এই 'invaluable' এবং 'most interesting History of Bengal' বইখানির নূতন সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন অনুভূত হয়। স্টুআর্টের এই ইতিহাসখানি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে পরম নিন্দাভাজন বলে গণ্য ছিল। দেখা যাচ্ছে বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ওই মনোভাব অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছিল। এই পরিবর্তনের আরও পরিচয় পাওয়া যায় এই উক্তিতে—“It will no doubt be gratifying to many to find, by a careful study of Major Stewart's History, that the condition of the people of Bengal under the Muhammadan rule was not so bad as is generally supposed”। পরিশেষে বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলা হয়েছে, স্বদেশের ইতিহাস গভীরভাবে অধিগত না হলে বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই এই বইখানিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের পাঠ্যরূপে নির্বাচন করবার জন্য কর্তৃপক্ষকে বিশেষ অনুরোধও করা হয়েছে এই ভূমিকায়। আমরা জানি উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে এই বইখানি দীর্ঘকাল স্কুল-কলেজের পাঠ্য ছিল।

১৯০৪—**Riyaz-us-Salatin :** আবতুস সালাম-কৃত সটীক ইংরেজি অনুবাদ।

গোলাম হুসেন সলীম-প্রণীত রিয়াজ-উস-সলাতীন হচ্ছে বাংলা দেশের সমগ্র মুসলমান যুগের একমাত্র ধারাবাহিক ফারসি ইতিহাস এবং স্টুআর্টের **History of Bengal**-এর প্রধান অবলম্বন। গোলাম হুসেন (মৃত্যু ১৮১৭) ছিলেন মালদহে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্থানীয় কর্মচারী **George Udny**-র ডাক-মুনসী (অর্থাৎ পোস্টমাস্টার)। উডনির আদেশেই গোলাম হুসেন বাংলার ইতিহাস সংকলন করে রিয়াজ-উস-সলাতীন নামে প্রকাশ করেন ১৭৮৮ সালে। গোলাম হুসেন দুই বৎসর বহুপরিশ্রম করে নানা গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং নিজে প্রাচীন কালের ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করে এই ইতিহাসখানি রচনা করেন। এই কার্যে গোলাম হুসেন যে যে গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন তার নাম করেননি। তবে আধুনিক অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়েছে, বাংলার নবাবী আমলের ইতিহাস রচনায় তিনি বহু পরিমাণেই সলিমুল্লা-প্রণীত 'তারিখ-ই-বঙ্গাল' নামক একটি গ্রন্থের উপরে নির্ভর করেছিলেন। এই গ্রন্থটি সলিমুল্লা রচনা করেন ১৭৬৩-৬৪ সালে তৎকালীন বাংলার গবর্ণর হেনরি ভ্যান্‌সিটার্টের নির্দেশে। এই বইটির **Gladwin**-কৃত ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৭৮৮ সালে। যাহোক, উনবিংশ শতকে স্টুআর্ট, ব্লকম্যান প্রভৃতি সব ঐতিহাসিকের বাংলার ইতিহাস আলোচনার প্রধান অবলম্বন

ছিল গোলাম্ হুসেনের রিয়াজ-উস-সলাতীন। ফলে বইটির একটি প্রামাণিক ইংরেজি অনুবাদের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই প্রয়োজনবোধেই বঙ্গীয় এশিআটিক সোসাইটি থেকে বইটির আবদুস সালাম-কৃত অনুবাদটি প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদের সঙ্গে যে টীকা সংযুক্ত হয়েছে তাতে বাংলার মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত, বিশেষতঃ তার সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্ত, পুনর্গঠনের প্রয়াস সুস্পষ্ট।

বিংশ শতকে এই বইটির অনেক অভাব ও দোষক্রটি ধরা পড়েছে এবং আধুনিক ঐতিহাসিকেরা আর আগের মত এই বইটির উপর অতটা নির্ভর করতে চান না। বইটিকে তাঁরা অবশ্য উপেক্ষা করেন না; কিন্তু সমকালীন রচনা, শিলালিপি, মুদ্রা প্রভৃতির সাহায্যে যাচাই ও সংশোধন না করে এই বইএর কোনো কথাকে সহজে মানতে চান না। এস্থলে বলা প্রয়োজন যে, গোলাম হুসেন নিজেই এই বইএর দোষক্রটি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন; তাই ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতদের সম্বন্ধে বলে গেছেন,—

It is desired of people conversant with past times, that if they detect any mistake or oversight, they will overlook it, in as much as this humble man is not free from shortcomings,...and further that, according to their capacity, they will correct the mistakes and defects, and if they cannot do so, they will be good enough to overlook them.

—আবদুস সালাম-কৃত অনুবাদ, পৃ ৪

গোলাম হুসেনের এই উক্তিতে আধুনিককালীন মুক্ত মনেরই পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে।

১৯০৪—সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালার ইতিহাস : নীলমণি মুখোপাধ্যায়।

'উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষার উপযোগী' এই বইখানি কখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল জানি না। ১৯০৪ সালে প্রকাশিত সংশোধিত সংস্করণমাত্র দেখেছি। গ্রন্থকার খ্যাতনামা ব্যক্তি, সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। কিন্তু বইখানি অকিঞ্চিৎকর। তথাপি এস্থলে এখানির উল্লেখ করবার একমাত্র সার্থকতা এই যে, এর থেকে বোঝা যায় তখনও আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে বাংলার ইতিহাস পঠন-পাঠনের একটা ব্যবস্থা ছিল। অন্ততঃ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাসের (১৮৭৪) সময় থেকেই এই ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল। বিদ্যালয়ে বাংলার ইতিহাস অধ্যাপনার প্রসঙ্গ যথাস্থানে বিশদভাবে আলোচনা করা যাবে।

১৯০৫—রিয়াজ-উস-সালাতিন : রামপ্রাণ গুপ্ত কৃত সটীক বঙ্গানুবাদ।

এই অনুবাদের প্রথম তিন উদ্যান ঐতিহাসিক চিত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই গ্রন্থের একটি বিস্তৃত ভূমিকা লিখেছিলেন, এটিও পূর্বে ঐতিহাসিক চিত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুবাদের প্রথম অংশের টীকা লিখেছিলেন।

১৯০৫—মীর কাসিম : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

এই গ্রন্থখানিও তখনকার দিনে বাঙালির ঐতিহাসিক চেতনাকে উদ্দীপ্ত করতে অনেকখানি সহায়তা করেছিল।

১৯০৭—ঐতিহাসিক চিত্র (তৃতীয় পর্যায়): নিখিলনাথ রায়-সম্পাদিত।

তৃতীয় পর্যায়ের উদ্দেশ্যও দ্বিতীয় বারেরই অনুরূপ। সুতরাং বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক। কিন্তু এবার ঐতিহাসিক চিত্রের আয়ুষ্কাল দীর্ঘতর হয়েছিল। এই তৃতীয় পর্যায় ছয় বৎসর বেঁচে থেকে বাঙালির মনে ইতিহাস-জিজ্ঞাসার উদ্‌বোধনে ও ইতিহাস-চেতনার প্রসারণে প্রচুর সহায়তা করেছে।

১৯০৭—বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত (প্রথম ভাগ): পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকগুলি বাদ দিলে সম্ভবতঃ এই গ্রন্থ-খানিকেই বাঙালির পক্ষে বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রথম প্রয়াস বলে স্বীকার করতে হয়। গ্রন্থের 'মুখবন্ধ' থেকে প্রয়োজনীয় অংশটুকু উদ্‌ধৃত করে দিচ্ছি। তার থেকেই এই পুস্তকের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা সহজ হবে।—

"বাঙ্গালার একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস দেখিতে পাই না। যাহা দেখিতে পাই তাহা সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ। উপকরণের অসদ্‌ভাবেই যে বাঙ্গালার ইতিহাসের এরূপ দুর্দশা আমার তাহা বোধ হয় না। আমার বিশ্বাস আলোচনা ও অনুসন্ধান অভাবেই বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস অদ্যাপি সংকলিত হয় নাই।

ইংরাজের পুস্তকে দেখি সপ্তদশ অশ্বারোহী বাঙ্গালা জয়

করিয়াছিল। কথাটা যাঁহারা বিশ্বাস করিলেন না তাঁহারা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ফলে বালুকাকণা সংগৃহীত হইয়া জাতীয় ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপিত হইল। আমিও সেই ভিত্তি গঠনের সাহায্যে বালুকাকণা সংগ্রহ করিলাম। ভরসা আছে, সাহিত্যমহারথীবৃন্দের মধ্যে কেহ এই ভিত্তির উপর প্রাসাদ নির্মাণ করিবেন।

এই খণ্ডে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্গালার তাবৎ জ্ঞাতব্য বিষয় প্রদত্ত হইল। দ্বিতীয় খণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিবৃত করার বাসনা আছে।

আগামী বর্ষের প্রারম্ভেই তাহা সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিব।...দুবরাজপুর, ১০ অগ্রহায়ণ ১৩১৪।”

৩৪৯ পৃষ্ঠার এই অনতিবৃহৎ গ্রন্থে পনেরো অধ্যায়ের স্বল্প পরিসরের মধ্যে বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে তৎকালজ্ঞাত প্রায় সমস্ত তথ্যই সংকলিত ও সুবিন্যস্তভাবে আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থকারের এই সাধু প্রয়াস সত্যই প্রশংসনীয় ও শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণীয়। এই বইখানির কথা এখন আর সুজ্ঞাত নয়। তার প্রধান কারণ এই গ্রন্থপ্রকাশের পর অল্পকালের মধ্যেই বাংলার ইতিহাস-রচনার ক্ষেত্রে রজনীকান্ত, হরপ্রসাদ, অক্ষয়কুমার, রমাপ্রসাদ, রাখালদাসের ন্যায় মহারথীদের আবির্ভাব। এঁদের প্রখর প্রতিভাজ্যোতিতে পরেশচন্দ্রের কীর্তি স্বাভাবিক ভাবেই আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। বর্তমান সময়ে বইখানির আর বিশেষ কিছু উপযোগিতাও নেই। কিন্তু তৎকালীন ইতিহাস-সাধনার

জনবিরল ক্ষেত্রে এই নিষ্ঠাবান্ লেখকের অনাড়ম্বর প্রথম উদ্যমের কথা বিস্মৃত হওয়া আধুনিক উত্তরসাধকদের পক্ষে অকর্তব্য।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ মাত্র আছে। দ্বিতীয় ভাগের কোনো সন্ধান পাইনি।

১৯১০—গৌড়ের ইতিহাস : রজনীকান্ত চক্রবর্তী, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আছে হিন্দু রাজত্বের ইতিহাস এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আছে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস। উভয় যুগের অন্যতম প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস হিসাবে এই বইটি বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়। দুই খণ্ডেই এমন অনেক বিষয় আছে যা পরবর্তী ঐতিহাসিকদের সত্যসন্ধানে প্রচুর সহায়তা করেছে।

১৯১০—রাজসাহীতে 'বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি' প্রতিষ্ঠা।

'বাঙ্গালীর ইতিহাসের উপাদান-সংকলনের আশায়, বরেন্দ্র-মণ্ডলে ধারাবাহিকরূপে তথ্যানুসন্ধানের আয়োজন করিবার অভিপ্রায়ে' দীঘাপতিয়ার রাজকুমার শরৎকুমার রায়ের উৎসাহে ও অর্থানুকূল্যে উক্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতি বাঙালির ইতিহাস সংকলনে কতখানি সহায়তা করেছে তা আজ সুবিদিত। এই সংঘবদ্ধ ইতিবৃত্ত-সন্ধানের গুরুত্ব আজও অনতিক্রান্ত রয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না।

১৯১০—সন্ধ্যাকরনন্দি-কৃত 'রামচরিতম্' : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-সম্পাদিত।

ভারতীয় সাহিত্য ইতিহাসহীনতার জন্য কুখ্যাত। এক

রাজতরঙ্গিণী ছাড়া আর কোনো গ্রন্থই ইতিহাসপদবাচ্য নয়। হর্ষচরিত প্রভৃতি অর্ধ-ইতিহাস-জাতীয় কাব্যের সংখ্যাও অতি কম। তার মধ্যে এই রামচরিত কাব্যখানি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। গ্রন্থকার বাংলার ইতিহাসের একটি দারুণ বিপ্লবের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। ফলে এই পুস্তকটির ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ, তাম্রশাসনাদি লেখসমূহ থেকে তার মূল্য বেশি বই কম নয়। বাংলার ইতিহাসবিষয়ক একমাত্র গ্রন্থ এখানি। এই বইটির একটিমাত্র পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয় ১৮৯৭ সালে; আবিষ্কর্তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয় তারও দীর্ঘকাল পরে। বঙ্গীয় এশিআটিক সোসাইটির স্মারক গ্রন্থ (তৃতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা) রূপে এর প্রথম প্রকাশ। সম্পাদক এই গ্রন্থের দীর্ঘ অবতরণিকায় (পৃ ২-১৭) গোপালের অভিষেক থেকে মদনপালের রাজত্বের শেষ পর্যন্ত পালরাজবংশের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস দেন। রাজা রাজেন্দ্রলালের **On the Pala and Sena Dynasties of Bengal** নামক প্রবন্ধটি বাদ দিলে আধুনিক কালে এই অবতরণিকাটিকেই বোধ করি পালবংশের প্রথম ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত বলে গণ্য করতে হয়। এই অবতরণিকার সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে, রামচরিত কাব্যকে আশ্রয় করে পালরাজত্বের ইতিবৃত্ত সংগঠনের প্রথম প্রয়াস হয়েছে এটিতেই।

১৯১১—**History of the Bengali Language and Literature :** দীনেশচন্দ্র সেন।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের এই ইংরেজি সংস্করণটি বাংলা দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে বাংলার বাইরে ব্যাপকভাবে পরিজ্ঞাত করতে বিশেষভাবেই সহায়তা করেছে। রমেশচন্দ্রের **Literature of Bengal** বইখানিই এতদিন পর্যন্ত অবাঙালি পাঠকের একমাত্র অবলম্বন ছিল। কিন্তু রমেশচন্দ্রের বইখানি ক্ষুদ্রায়তন; তা ছাড়া দীনেশচন্দ্রের অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে বহুশাখায়িত রূপ আবিষ্কৃত হয়েছে, রমেশচন্দ্রের পুস্তকখানিতে তার পরিচয় প্রত্যাশা করাও যায় না। সেই জন্যই ইংরেজি ভাষায় বাংলা সাহিত্যের একখানি বৃহত্তর ইতিহাস-পুস্তকের বিশেষ অভাব ছিল। আলোচ্যমান বইখানির দ্বারা সে অভাব বহুলাংশেই পূর্ণ হয়েছে। পরবর্তী কালে অবশ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে আরও দুখানি বই প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু সে দুখানিই স্বল্পায়তন। সুতরাং বৃহৎ পরিধির মধ্যে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহাসিক পরিচয় জানতে হলে অবাঙালির পক্ষে আজও এই গ্রন্থখানিই একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমাদের গবেষণা ও জ্ঞান অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। সুতরাং বর্তমান জ্ঞানের উপযোগী করে বড় আয়তনের আর-একখানি ইংরেজি গ্রন্থের বিশেষ অভাব ঘটেছে। আশা করি সে অভাব পূর্ণ হতে খুব বেশি বিলম্ব হবে না।

১৯১২—গৌড়রাজমালা : রমাপ্রসাদ চন্দ।

এই বইখানি প্রকাশিত হয় বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি থেকে

এবং তার একটি সুচিন্তিত 'উপক্রমণিকা' লিখে দেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়। উক্ত উপক্রমণিকাতে একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, অক্ষয়কুমার বার বার 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' কথাটাই ব্যবহার করেছেন, বঙ্গদেশের বা বাঙ্গালার ইতিহাস কথাটা ব্যবহার করেননি। এই প্রয়োগটা তাৎপর্যহীন নয়, বরং তার দ্বারাই আমাদের পুরাবৃত্ত সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। যাহোক, গৌড়রাজমালা সম্পর্কে প্রধান বক্তব্য এই যে, 'বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী'তে রচিত প্রথম বাংলার ইতিহাস বলে পরিচিত হবার মর্যাদা এই গ্রন্থেরই প্রাপ্য। নিরপেক্ষ উদার দৃষ্টিতে দেশের ইতিহাসকে সমগ্রভাবে দেখার সূত্রপাত হয় এই গ্রন্থ রচনার সময় থেকেই।

১৯১২—গৌড়লেখমালা: অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

এখানি হচ্ছে প্রাচীন বাংলার (পালরাজত্বকালের) তাম্র-শাসনাদি লেখসংগ্রহ। বাংলার ইতিহাসের মূল-উপাদান সংকলনের প্রথম সার্থক প্রয়াসের ফল এই গ্রন্থখানি। এই তার বিশেষ গৌরব। এখানিও বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির দান।

১৯১৫—**The Palas of Bengal**: রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বইখানি বঙ্গীয় এশিআটিক সোসাইটির স্মারকগ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হয়। রাখালদাস (১৮৮৬-১৯৩০) শুধু যে একজন প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক তা নয়; বাংলার পুরাবৃত্তকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁদের মধ্যে তাঁর

স্থান প্রথম পংক্তির একেবারে গোড়ার দিকে। বাঙালিদের মধ্যে বোধ করি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই (১৮২২-৯১) সকলের আগে বাংলার প্রাচীন যুগের ইতিবৃত্তকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনার সূচনা করেন। এশিআটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর **On the Pala and the Sena Dynasties of Bengal** নামক প্রবন্ধটিকেই উক্তপ্রকার আলোচনার অগ্রদূত বলে স্বীকার করা যায়। এই প্রবন্ধটি পরে তাঁর **Indo-Aryans** নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের (১৮৮১) অন্তর্ভুক্ত হয়। রাখালদাসের গ্রন্থে এই লেখাটির পরিণত রূপের সাক্ষাৎ পাই। তা ছাড়া হরপ্রসাদ-সম্পাদিত রামচরিতম্ গ্রন্থখানিকেও বাংলার পালযুগের ইতিহাস-রচনায় বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত কাজে লাগানো হয়েছে।

১৯১৫—বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড : রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

দশ বৎসরব্যাপী উপাদান সংগ্রহের ফল এই গ্রন্থ। শুধু উপাদানপ্রাচুর্য নয়, নিরপেক্ষ উদার দৃষ্টিভঙ্গিও এই গ্রন্থের একটি বৈশিষ্ট্য। গৌড়রাজমালায় বাংলার ইতিবৃত্ত আলোচনায় যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সূত্রপাত হয় তার পরিণতি ঘটে এই গ্রন্থে। বস্তুতঃ এই গ্রন্থ প্রকাশের ফলেই বাংলার পুরাবৃত্ত আলোচনার ক্ষেত্রে একটি নূতন পর্যায়ের সূচনা হয়েছিল। এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পদে পদে মূল-উপাদানের উল্লেখ ও উদ্‌ধৃতি। ফলে আজও এই ইতিহাসখানির

উপযোগিতা বহুলাংশে অব্যাহত আছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞের কাছে বইখানি যতই মূল্যবান্ হোক, সাধারণ পাঠকের কাছে এখানি সুখপাঠ্য নয়। প্রত্নতাত্ত্বিক জটিলতা ও তর্কবিতর্কের মধ্যে পথ করে এই গ্রন্থ থেকে বাংলার ইতিহাসের মূলধারাটি অনুসরণ করা সাধারণ পাঠকের পক্ষে সহজসাধ্য নয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯১৫ সালেই প্রবীণ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক আহূত হয়ে সিনেট হাউসে "পালসাম্রাজ্যের অধঃপতন" সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা করেন। তাতে উক্ত যুগের ইতিবৃত্তের উপর অনেকখানি নূতন আলোকপাত হয়। এই বক্তৃতামালা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

১৯১৬—**Indo-Aryan Races :** রমাপ্রসাদ চন্দ।

বইখানি মুখ্যতঃ নৃতত্ত্ববিষয়ক। প্রাচীন বাংলার নৃতত্ত্ব সম্বন্ধেও এটিতে প্রচুর উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। এক কালে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' সম্পর্কে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে তারই পরিণতি ঘটেছে মনে করা যায়।

বাংলার প্রবীণ সিভিলিআন এফ. জে. মোনাহান এই সময়ে বাংলার তুর্কিপূর্ব যুগের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত রচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৯১৬ সালেই ক্যালকাটা হিস্টরিকাল সোসাইটির (১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত) মুখপত্র **Bengal Past and Present** কাগজে (Vol. XIII, Part I) তাঁর Early

History of Bengal নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধের প্রথম অংশ প্রকাশিত হয়। মৌর্যরাজত্বকাল থেকে তিনি বাংলার পুরাবৃত্ত আরম্ভ করেন। তিন-চার বছর ধরে তাঁর এই রচনাটি উক্ত পত্রিকাতেই খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়। রচনাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত হলে বোধ করি এটিই বাংলার সমগ্র তুর্কিপূর্ব যুগের প্রথম ইংরেজি ইতিবৃত্ত বলে স্বীকৃত হত। গ্রন্থকার ইংরেজ হলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপরে তাঁর অব্যাহত অধিকার ছিল। তাই পূর্বোক্ত সমস্ত বাংলা বইকেই তিনি পুরোপুরি ভাবেই কাজে লাগাতে পেরেছিলেন।

এই ১৯১৬ সালেই বাংলার তৎকালীন গভর্ণর লর্ড রোনাল্‌ড্‌সের একান্তসচিব ডব্‌ল্‌-ইউ. আর. গুরলে সাহেব তিন খণ্ডে একখানি বাংলার ইতিহাস সংকলনে উদ্‌যোগী হন। তাঁর অভিপ্রায় ছিল বাংলার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকদের সমবেত চেষ্টায় ওই সংকলনকার্য সম্পন্ন করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলনাথ রায়, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতিকে আমন্ত্রণ করেন। তদনুসারে উক্ত তিন খণ্ডের অধ্যায়বিভাগ, লেখকনির্বাচন প্রভৃতি প্রাথমিক কার্য অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে এই প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয়নি। তথাপি সংঘবদ্ধভাবে বাংলার সম্পূর্ণ (প্রাচীনতম কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত) ইতিবৃত্ত সংকলনের প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে এই ঘটনাটি স্মরণীয়।

১৯১৭—বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড : রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই গ্রন্থে তুর্কিবিজয়ের সময় থেকে ১৫৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলার ইতিবৃত্ত অনুসরণ করা হয়েছে। স্টুআর্ট সাহেবের **History of Bengal** (১৮১৩) এবং রজনীকান্ত চক্রবর্তীর গৌড়ের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডের (১৯১০) সঙ্গে তুলনা করলে অনায়াসেই বোঝা যায় এই পুস্তকে উক্ত যুগের ইতিহাসের উপরে যে আলোকপাত করা হয়েছে এবং এই উপলক্ষ্যে যে উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে তা অভূতপূর্ব। এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি উক্তি মূল-উপাদানের দ্বারা সমর্থিত, একথা বলা অন্যায় নয়। বইখানি সম্পূর্ণরূপেই তৎকালজাত ক্ষোদিতলিপি, মুদ্রা ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই হিসাবে ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের বিচারে এটি বাংলার তুর্কিরাজত্ব কালের ইতিবৃত্ত আলোচনার ক্ষেত্রে নবযুগের প্রবর্তন করেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলার তুর্কিযুগের ইতিবৃত্ত সন্ধানে রাখালদাসের যোগ্য অনুবর্তী দীর্ঘ কালের মধ্যে আবির্ভূত হননি। তা ছাড়া এই দ্বিতীয় খণ্ডখানিও (প্রথম খণ্ডেরই মতো) সুখপাঠ্য ধারাবাহিক ইতিহাসরূপে লিখিত নয়। ফলে এই গ্রন্থ সাধারণ পাঠকের মনেও এই যুগ সম্পর্কে যথোচিত ঔৎসুক্য সৃষ্টি করতে পারেনি।

১৯২২—**Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal**: নলিনীকান্ত

বাংলার তুর্কিযুগের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে রাখালদাসের কাজকে যাঁরা পরিপূরণ করেছেন তাঁদের মধ্যে নলিনীকান্তের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থ বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে জটিলতামোচনে অনেকখানি সহায়তা করেছে।

১৯২৩—মধ্যযুগে বাঙ্গলা : কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থখানি বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধের সমষ্টি। সুতরাং এটিকে তৎকালীন বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস বলা যায় না। কিন্তু এটিতে বাংলার মধ্যযুগের জাতীয় তথা সামাজিক জীবনের একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। এটাই এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর কোনো বইতেই মধ্যকালীন বাংলার এতখানি সামাজিক ইতিহাস পাওয়া যায় বলে মনে হচ্ছে না।

১৯২৩—বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড : রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ; দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পরে আট নয় বৎসরে বাংলার প্রাচীন যুগ সম্পর্কে যেসব নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়, তার সবই এই সংস্করণে গৃহীত হয়েছিল। এইসব নূতন তথ্যের আলোকে গুপ্ত, পাল এবং সেন রাজত্বকালের ইতিবৃত্ত নূতন করেই লিখতে হয়েছিল। সুতরাং অনেকাংশেই নূতন গ্রন্থের মর্যাদা এই সংস্করণের প্রাপ্য।

১৯২৪—**Early History of Bengal** : রমেশচন্দ্র মজুমদার।

বাংলা পুরাবৃত্তের আদিতম যুগ সম্বন্ধে একখানি ছোট বই বইখানি ছোট বটে, কিন্তু তাতে উক্ত যুগের বাংলার পুরাবৃত্ত সংকলনের পক্ষে অনেক চিন্তনীয় বিষয় আছে।

১৯২৫—**Early History of Bengal: F. J. Monahan.**

এই নামে মোনাহান-কৃত ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশের (**Bengal Past and Present,** ১৯১৬) কথা যথাস্থানে উল্লেখ করেছি। এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তুকেই সবিস্তারে নূতন করে রচনা করার ফলেই উল্লিখিত বইখানি প্রকাশিত হয়। এটিতে শুধু মৌর্যরাজত্বকালের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থকারের অভিপ্রায় ছিল অন্যান্য খণ্ডে তুর্কিবিজয়কাল পর্যন্ত বাংলার ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত লেখা। কিন্তু সেসব অংশ রচনার পূর্বেই অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯২৯—**Inscriptions of Bengal:** ননীগোপাল মজুমদার।

এখানি হচ্ছে পূর্বোক্ত 'গৌড়লেখমালা'র পরিপূরক গ্রন্থ। 'গৌড়লেখমালা'তে আছে বাংলার পালরাজবংশের ইতিবৃত্ত-বিষয়ক শিলা- ও তাম্র-লেখসমূহের মূলপাঠ, অনুবাদ ও ভাষ্য। এখানিতে আছে চন্দ্র, বর্মন্ ও সেন রাজত্বকালের লেখসমূহের মূলপাঠ, অনুবাদ ও ভাষ্য। পার্থক্য এই যে, লেখমালার ভাষা বাংলা আর এখানির ইংরেজি। বলা বাহুল্য প্রাচীন বাংলার ইতিবৃত্ত সংকলনের পক্ষে এই দুখানিই

হচ্ছে গবেষক ও লেখকের প্রধানতম অবলম্বন। দুঃখের বিষয় বই-দুখানি এখন আর বাজারে পাওয়া যায় না। বাংলার ইতিবৃত্তচর্চার সহায়তার জন্য বইদুটির পুনঃসম্পাদন ও প্রকাশ অত্যাবশ্যক। এস্থলে বলা অসংগত হবে না যে, পালপূর্ব যুগের লেখমালা আজও গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়নি; এই সংকলনকার্যে পুরাতত্ত্ব-বিশেষজ্ঞদের অবিলম্বে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। যথাযোগ্য উপাদান-সংগ্রহের অভাবে দেশের ঐতিহাসিক গবেষণা ও গ্রন্থরচনা অনেকাংশে ব্যাহত ও বিলম্বিত হচ্ছে।

১৯৩১—**Dynastic History of Northern India**, প্রথম খণ্ড: হেমচন্দ্র রায়।

এই বইএর ষষ্ঠ অধ্যায়ে (পৃ ২৭১-৩৯০) গুপ্তোত্তর কাল থেকে তুর্কিবিজয় পর্যন্ত বাংলার রাজবংশগুলির ইতিবৃত্ত ধারাবাহিক ভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। আর পঞ্চম অধ্যায়ে (পৃ ২৩৫-২৭০) আছে আসামের প্রাচীন ইতিবৃত্ত। প্রত্যেক রাজার প্রসঙ্গে তাম্রলেখাদি মূল-উপাদানের সংক্ষিপ্ত মর্ম দেওয়া হয়েছে। আর আছে আসাম ও বাংলার দুটি সুন্দর মানচিত্র, যার থেকে প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক রূপ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যায়। বোধ করি এর পূর্বে প্রাচীন বাংলার এমন সুষ্ঠু মানচিত্র কোথাও প্রকাশিত হয়নি। এই গ্রন্থের নাতিবিস্তৃত ও নাতিসংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বিবরণ প্রাচীন বাংলা ও আসামের রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্তকে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে অনেকখানি সুগম করেছে। আর, উক্ত মানচিত্র দুটিও এবিষয়ে কম সহায়তা করেনি।

১৯৩১—কামরূপশাসনাবলী : পদ্মনাথ ভট্টাচার্য।

পূর্বোক্ত গৌড়লেখমালা যেমন বাংলার ইতিবৃত্ত সংকলনের ভিত্তিস্বরূপ, এই উপাদান-গ্রন্থখানিও তেমনি আসামের প্রাচীন ইতিবৃত্ত গঠনের প্রধান অবলম্বন। প্রাচীন বাংলা ও কামরূপের ইতিবৃত্ত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ; একের ইতিবৃত্ত অনেকাংশেই অপরের উপর নির্ভরশীল। তাই এই গ্রন্থখানিও বাংলার পুরাতত্ত্ব-গবেষণার পক্ষে অত্যাবশ্যক বলে স্বীকার্য।

১৯৩৩—**Early History of Kamarupa :** কনকলাল বড়ুয়া।

এখানিই বোধ করি প্রাচীন কামরূপ বা আসামের সর্বপ্রথম ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত। বাংলা ও আসামের পারস্পরিক ঐতিহাসিক সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে এই গ্রন্থখানির নামোল্লেখও অবশ্যকর্তব্য।

Sir Edward Gait-এর **History of Assam** বইটিকেই অবশ্য আসামের প্রথম ইতিহাস বলে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এটি মুখ্যতঃ আহোম-যুগের ইতিহাস। আহোমপূর্ব যুগের ইতিহাস এই গ্রন্থে অতি সামান্যই আছে। বাংলার ইতিহাসের পক্ষে এই গ্রন্থখানির মূল্য খুব বেশি নয়, তবে একেবারে উপেক্ষণীয়ও নয়।

১৯৩৪—**History of North-Eastern India :** রাধাগোবিন্দ বসাক।

গুপ্তরাজত্বকালের আরম্ভ থেকে পালবংশের অভ্যুদয় পর্যন্ত

(খ্রী ৩২০-৭৬০) প্রায় চারশো বছরের ইতিহাস আছে এই গ্রন্থে। শুধু বাংলাদেশ নয়, কামরূপ নেপাল মগধ উড্র প্রভৃতি প্রতিবেশী জনপদগুলির ইতিবৃত্তও অনুসরণ করা হয়েছে। ফলে বাংলার পুরাবৃত্তকে বৃহত্তর পটভূমিকায় দেখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের সঙ্গেই দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসও বিবৃত হয়েছে ; এটা এই গ্রন্থের একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য।

১৯৩৫—বৃহৎ বঙ্গ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড : দীনেশচন্দ্র সেন।

বারোশো পৃষ্ঠার এই সুবৃহৎ গ্রন্থে আদিকাল থেকে পলাশির যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলার সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। ১৯১৬ সালে গুরলে সাহেব বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস-সংকলনের ভার যে ঐতিহাসিকসংঘের উপরে অর্পণ করেছিলেন, তার মধ্যে দীনেশ-চন্দ্রও ছিলেন। পূর্বে বলেছি সমবেতভাবে বাংলার ইতিবৃত্ত সংকলনের এই প্রয়াস নানা কারণে পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু সে সময়ে দীনেশচন্দ্রের মনে যে সংকল্প জাগে তারই ফল এই 'বৃহৎ বঙ্গ'। বইখানি দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রমের ফল এবং তাতে একাধারে বহু তথ্য ও তত্ত্বের সমবায় ঘটেছে যার ফলে অভিজ্ঞ পাঠকের মনে পদে পদেই বিচিত্র চিন্তা জেগে ওঠে ; বইটির পক্ষে এটা কম গৌরবের কথা নয়।

কিন্তু এর ত্রুটিগুলিও উপেক্ষণীয় নয়। প্রথমতঃ ভাষা। এই গ্রন্থের ভাষায় এমন একটি প্রবল আবেগ আছে যা পাঠকের মনে ভাবকে উদ্দীপ্ত করে, বিচারবুদ্ধিকে উদ্রিক্ত করে না। এ বিষয়ে লেখক সচেতন ছিলেন। নিজেই স্বীকার করেছেন, "এই

পুস্তকের ভাষা হয়ত ঠিক বিজ্ঞানসংগত, ওজন-করা নির্লিপ্ত ঐতিহাসিকের ভাষা হয় নাই। আজ বঙ্গের শ্মশানের উপর দাঁড়াইয়া বাঙ্গালী লেখক যদি মাঝে মাঝে অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া থাকেন, কিংবা কিছু বিচলিত হইয়া উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে আশা করি তিনি ঐতিহাসিকের ক্ষমা হইতে বঞ্চিত হইবেন না।" বলা বাহুল্য এ বিষয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ পূর্বগামীদেরই অনুবর্তী।

দ্বিতীয়তঃ বিষয়বস্তু। গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হয়েছে, "এমন দেবতার নৈবেদ্য নাই, যাহাতে চঞ্চুর আঘাত না করিয়াছি।... ঐতিহাসিক কিংবদন্তী বা উপগল্প, তাহার যে মূল্যই থাকুক না কেন, তাহা আমি বাদ দিই নাই। তাহা যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকের বিচারাধীন করিয়াছি। কারণ জাতীয় ইতিহাস-গঠনের প্রাক্কালে সামান্য খড়কুটোরও কিছু মূল্য আছে, কিছুই উপেক্ষার বিষয় নহে। আজ যাহা উপেক্ষিত হইতেছে, হয়ত ভাবী আবিষ্কারের আলোকপাতে কালে তাহার একটা মূল্য দাঁড়াইতে পারে।" এই উক্তিতেই গ্রন্থের স্বরূপ, তার গুণ এবং ত্রুটি, দু-ই প্রকাশ পেয়েছে। অনির্ণীতমূল্য অজস্র তথ্য সংকলনের ফলে বইখানি যথার্থ ইতিহাসের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, অথচ ঠিক উপাদানগ্রন্থের মর্যাদাও লাভ করতে পারেনি। তার কারণ ইতিহাসচর্চায় গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতার অভাব। গ্রন্থকার এ বিষয়ে অচেতন ছিলেন না। তিনি অকুণ্ঠিতভাবেই স্বীকার করেছেন, "আমি বঙ্গভাষা ও সাহিত্য লইয়া জীবন কাটাইয়াছি,

ইতি [illegible] আমি অপরিচিত।...কৃতী অধ্যাপকের দল পদে
দ আমার ত্রুটি পাইবেন।" এস্থলে একটি ত্রুটির কথা উল্লেখ
করা অন্যায় হবে না। বইএর ভূমিকায় আছে, "বৃহৎবঙ্গ নামটি
আমার স্বকপোলকল্পিত বা আধুনিক নহে। ১৯০৩-০৪ সনের
[illegible]রকিওলজিকাল রিপোর্টে উদ্‌ধৃত হীরানন্দ শাস্ত্রীর গৃহীত পাঠে
আমরা গোয়ালিয়র-প্রশস্তিতে 'বৃহদ্‌বঙ্গান্‌' কথাটি পাইয়াছি।"
হীরানন্দ শাস্ত্রী-সম্পাদিত গোয়ালিয়র-প্রশস্তিতে 'বৃহদ্‌বঙ্গান্‌'
আছে বটে (উক্ত গ্রন্থের ২৮২ পৃ)। কিন্তু দীনেশচন্দ্র লক্ষ্য
করেন নি যে, ১৯২৫-২৬ সালের এপিগ্রাফিআ ইণ্ডিকাতে (১৮শ
খণ্ড) প্রবীণ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার-কর্তৃক পুনঃসম্পা-
দিত গোয়ালিয়র-প্রশস্তিতে 'বৃহদ্‌বঙ্গান্‌' নেই, আছে 'বৃহদ্‌বংশান্‌'
(পৃ ১০৯)। বলা বাহুল্য, এরকম স্থলে 'বৃহৎবঙ্গ' কথাটির
প্রাচীনতা প্রচার অনুচিত।

বস্তুতঃ অভ্রান্ততার দাবি দূরে থাক, গ্রন্থকার এই বইএর জন্য
কোনো কৃতিত্বেরই দাবি করেননি। তাঁর উক্তি এই—"এক্ষেত্রে
আমার মনস্বিতা বা প্রতিভার দাবি নাই, দিনমজুরের পারিশ্রমি-
কের দাবি। পুস্তকখানি আমি নানারূপ গুরুতর সমস্যার দ্বারা
জটিল করি নাই; নানারূপ বিভিন্ন মতের ঘূর্ণীপাকে পড়িয়া
পাণ্ডিত্যপ্রদর্শনের কোন চেষ্টা করি নাই, আমার সেরূপ পাণ্ডিত্যও
নাই।...আমার এই পুস্তক ভাবী ঐতিহাসিকগণের পক্ষে একখানি
পাদপীঠরূপে গণ্য হইলে ধন্য হইব। তাঁহারা ইহার উপর দাঁড়াইয়া
বঙ্গজননীর যে মহিমান্বিত প্রতিমা গড়িবেন, সেই শুভস্বপ্ন আমার

সমস্ত শ্রমকে সার্থক করিয়াছে ; এই কল্পনা আমার লেখনীকে বলদৃপ্ত ও আশান্বিত করিয়াছে।" এই উক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রও ইতিহাসের দুর্গম অরণ্যে ভাবী সেনাপতির জন্য পথ নির্মাণের মজুরদারির বেশি কৃতিত্ব দাবি করেননি। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, বাংলার ভাবী ঐতিহাসিক বৃহৎ-বঙ্গ বইখানিকে পাদপীঠরূপে ব্যবহার করে বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের প্রতিমা গড়ে তুলবেন, দীনেশচন্দ্রের এই আশা কিছুমাত্র অন্যায় নয়। বস্তুতঃ বাংলা ভাষায় লিখিত এই বৃহৎ গ্রন্থখানি যে সাধারণ পাঠকের ঐতিহাসিক চেতনাকে জাগিয়ে তোলার এবং বাংলার ভাবী ঐতিহাসিকের পথ চলার অনেক সহায়তা করেছে তাতে সন্দেহ নেই। এই বইএর বহু দোষ স্বীকার করেও গুণগুলিকে মেনে নিতে হবে। একটা বড় গুণ হল এর ছবিগুলি এবং তার প্রাচুর্য। বিশেষজ্ঞের পক্ষে তার প্রয়োজনীয়তা যাই হোক না কেন, সাধারণ পাঠকের পক্ষে ছবির মূল্য অপরিসীম। কেননা, এক্ষেত্রে চোখের ভিতর দিয়ে যেভাবে মরমে প্রবেশ করা যায় তেমন আর কিছুতেই নয়। এই পুস্তকের ছবিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পাঠ্যবস্তুর পাশে পাশে মুদ্রিত চিত্রগুলি। বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকে এরকম ছবি সর্বদাই দেখা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণের পাঠোপযোগী ইতিহাস-গ্রন্থে এধরণের ছবি দেখা যায় না। এই বিশিষ্টতার কৃতিত্ব বোধ করি একমাত্র এই গ্রন্থেরই প্রাপ্য। এই গ্রন্থের আর-একটি

বৈশিষ্ট্য গ্রন্থকারের দৃষ্টির ব্যাপ্তি। একেবারে আদিকাল থেকে ইংরেজের অভ্যুদয় পর্যন্ত বাংলার দীর্ঘ দুই পর্বের ইতিহাস একই গ্রন্থকারকর্তৃক অনুসৃত হবার দৃষ্টান্ত কম। দীনেশচন্দ্রের পূর্বে রজনীকান্ত চক্রবর্তী এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া বোধ করি আর কেউ প্রাচীন ও মধ্য উভয় যুগের ইতিহাসকেই সমভাবে আয়ত্ত করতে প্রয়াসী হননি। দীনেশচন্দ্র কিন্তু বাংলার ইতিহাসকে একেবারে পলাশির যুদ্ধ পর্যন্ত অনুসরণ করতে সাহসী হয়েছিলেন। শুধু কালব্যাপ্তি নয়, বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তিও আছে এই গ্রন্থে। রাষ্ট্রীয় বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সর্বাঙ্গীণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পরিচয় দেবার প্রয়াস সর্বত্র সুস্পষ্ট। লেখকের দৃষ্টির ভাবাবিষ্টতা সত্ত্বেও তার এই কালগত ও বস্তুগত ব্যাপকতা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

১৯৩৭ (?)—বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড: রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; তৃতীয় সংস্করণ। এই সংস্করণের কোথাও প্রকাশের তারিখ নেই। উল্লিখিত তারিখটি আনুমানিক। হয়তো আরও পরেই এই সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

এই গ্রন্থখানির তিন সংস্করণ প্রকাশ যুগপৎ বইখানির মূল্যবত্তা তথা বাঙালি পাঠকের ক্রমবর্ধমান ঐতিহাসিক ঔৎসুক্যের পরিচায়ক। ১৯৩০ সালে গ্রন্থকারের মৃত্যু হয়। তাই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের দীর্ঘকাল পরে নবাবিষ্কৃত তথ্যের আলোকে গ্রন্থখানির সংশোধন ও সম্পাদনের ভার অর্পিত হয়

রাখালদাসের বন্ধু প্রবীণ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের উপরে। তাঁর সম্পাদনায় যথোচিত সংশোধনের ফলে এই সংস্করণটিকেও বাংলার পুরাবৃত্তচর্চার ইতিহাসে অনেকাংশেই একটি নূতন গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া সংগত।

১৯৩৯—**Early History of Bengal**, প্রথম খণ্ড: প্রমোদলাল পাল।

বইখানির আয়তন বড় নয়, এবং আদি থেকে তুর্কি-আবির্ভাব-কাল পর্যন্ত শুধু প্রাচীন যুগের বিবরণই আছে এই গ্রন্থে। কিন্তু ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতার সহিত সমস্ত উপাদানেরই সতর্ক ব্যবহারের যে আগ্রহ ও নৈপুণ্য এর ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা এই গ্রন্থকে প্রশংসনীয় বিশিষ্টতা দান করেছে। গ্রন্থের ভূমিকায় ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার যথার্থতঃই বলেছেন, **"It undoubtedly marks a distinct advance over the existing books on the subject"**। ফলে প্রাচীন বাংলার ইতিবৃত্তকে দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্যে চিনে নেওয়া কতকাংশে সহজ হয়েছে।

১৯৩৯—সন্ধ্যাকরনন্দিকৃত রামচরিতম্; রমেশচন্দ্র মজুমদার, রাধাগোবিন্দ বসাক এবং ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়-কর্তৃক সম্পাদিত।

সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত (১৯১০), গৌড়লেখমালা (১৯১২) এবং **Inscriptions of Bengal** (১৯২৯), এই তিনখানিমাত্র বাংলার ইতিবৃত্ত সংকলনের সহায়ক উপাদানগ্রন্থ। হরপ্রসাদ

শাস্ত্রী-সম্পাদিত রামচরিতের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপিতে উক্ত কাব্যের চার পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের মাত্র পঁয়ত্রিশটি শ্লোকের টীকা ছিল, বাকি অংশের টীকা পাওয়া যায়নি। তাঁর সম্পাদনায় শুধু মূল পাঠ এবং উক্ত আংশিক টীকাই প্রকাশিত হয়েছিল। একথা সুবিদিত যে, এই কাব্যটি আগাগোড়াই দ্ব্যর্থক এবং টীকার সাহায্য ছাড়া এর ঐতিহাসিক অর্থ উদ্ধার করা সহজসাধ্য নয়। দীর্ঘকাল পরে উক্ত বিশেষজ্ঞত্রয়কর্তৃক পুনঃসম্পাদিত হয়ে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হল। এবার পূর্বসম্পাদনার অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এবার ওই কাব্যের বাকি অংশেরও নূতন সংস্কৃত টীকা (সম্পাদকত্রয়কৃত) এবং সমগ্র গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদও দেওয়া হয়েছে। বস্তুতঃ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে সম্পাদিত এই সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণটি প্রকাশের ফলে বাংলার ইতিবৃত্ত গবেষণার ক্ষেত্রে একটি বৃহৎ অভাব পূরণ হয়েছে এবং উক্ত ইতিবৃত্তের উপরে প্রচুর নূতন আলোকপাত করাও সম্ভব হয়েছে।

বাঙালির ইতিহাসের উপাদানগ্রন্থ মাত্র তিনটি, এবং তিনটিই প্রকাশিত হয়েছে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি থেকে। এটা উক্ত সমিতির পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। বলা প্রয়োজন যে, আরও অনুরূপ উপাদানগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া অত্যাবশ্যক। নতুবা বাংলার ইতিহাসচর্চার পথ সুগম হবে না।

১৯৩৯—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : আশুতোষ ভট্টাচার্য।

বাংলার ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এই বইখানির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। গ্রন্থের পরিচায়িকায় মনস্বী সুশীলকুমার দে বলেছেন, "বর্তমান গ্রন্থে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করা হয় নাই।...প্রাচীনকালে ধর্মবিপ্লব ও সাম্প্রদায়িক ধর্মবিরোধের সংঘর্ষে ও সামঞ্জস্যে বাঙ্গালা সাহিত্য কিরূপ পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, তাহা মঙ্গলকাব্যের বিশিষ্ট ধারার মধ্য দিয়া লেখক অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।" অধুনাপূর্ব যুগে বাংলার শৈব, শাক্ত ও বিভিন্ন লৌকিক ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও ক্রমবিকাশ এবং তৎকালীন সমাজের চিত্র কিভাবে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে, গ্রন্থকার তার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। নিছক সাহিত্য-বিকাশের ইতিহাস নয়, পরন্তু মধ্যযুগের বাংলার ধর্ম- ও সমাজ-বিবর্তনের ইতিবৃত্ত এই গ্রন্থের প্রধান কথা। গ্রন্থকার তাঁর নিবেদনে বলেছেন, "ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ-বৈষ্ণব-নিষেবিত সমাজই বাংলার সমাজের সম্পূর্ণ পরিচয় বহন করিতে পারে না, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের রচয়িতৃগণ এই একটি অতি মূল্যবান্ কথা এ পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। সেইজন্য উচ্চতর বর্ণের সমাজের বাহিরে তাঁহারা আর দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পান না। এই উপেক্ষা হইতেই বাংলার সমাজের একটি মৌলিক দিক্ উপেক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। এই গ্রন্থে যথাসাধ্য বাংলার সেই প্রাচীনতম লৌকিক ধর্মগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার প্রয়াস

পাইয়াছি। কারণ মধ্যযুগের সাহিত্যকে মধ্যযুগের এই লৌকিক ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করা যায় না।" বস্তুতঃ এই বইখানি মুখ্যতঃ মঙ্গলকাব্যের সাহিত্যিক ইতিহাস নয়, মঙ্গলকাব্য অবলম্বনে বাংলার সমাজ ও লৌকিক ধর্মের ইতিবৃত্ত বর্ণনাই এই গ্রন্থের মুখ্য বিষয়। আর, এটাই এই পুস্তকের বিশেষ মূল্য। দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৫০) এই সমাজ- ও ধর্ম-গত ইতিহাসের দিক্‌টিকেই স্ফুটতর ও দৃঢ়তর করা হয়েছে। এই সংস্করণে গ্রন্থখানি প্রায় আদ্যোপান্ত পুনর্লিখিত হয়েছে এবং গ্রন্থকারের মতে এটিকে একখানি নূতন পুস্তকও বলা চলে। তাঁর মতেই "পুস্তকখানির মধ্যে যে-সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—প্রথমতঃ নৃতত্ত্ব, দ্বিতীয়তঃ ইতিহাস ও তৃতীয়তঃ সাহিত্য"। প্রথম দুই বিষয়ে তিনি যথাক্রমে বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিৎ ডক্টর ভেরিয়র এল্‌উইন এবং খ্যাতনামা ঐতিহাসিক নলিনীকান্ত ভট্টশালীর পরামর্শ ও উপদেশেই অনেকাংশে চালিত হয়েছেন। অতঃপর তিনি বলেন, "এই গ্রন্থের একমাত্র সাহিত্যবিষয়ক আলোচনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমি নিজের উপর গ্রহণ করিতেছি; এইজন্য এই অংশই পুস্তকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল বলিয়া অনুভূত হইতে পারে"।

মোট কথা বাংলার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস হিসাবে এই গ্রন্থখানি ভাবী ঐতিহাসিকদের কাছে অপরিহার্য বলে গণ্য হবে।

১৯৪০—**Early History of Bengal**, দ্বিতীয় খণ্ড : প্রমোদলাল পাল।

তুর্কিপূর্বকালীন বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে। এতকাল বাংলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের বহিরবয়ব গঠনেই ঐতিহাসিকরা প্রধানতঃ ব্যস্ত ছিলেন। অবশ্য কেউ কেউ জাতীয় জীবনের সাধারণ দিক্‌টা নিয়েও কিছু কিছু আলোচনা করছিলেন; কিন্তু সে আলোচনা কখনও সমগ্রতা পায়নি এবং একটি গ্রন্থের আকারে প্রকাশযোগ্যতার পর্যায়েও উঠতে পারেনি। এই হিসাবে এই গ্রন্থখানির একটা বিশেষ মর্যাদা আছে। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু এখানিকেই বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচনায় অগ্রণী বলে স্বীকার করতে হবে। এদিক্ থেকে বিচার করলে বলতে হবে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের চেয়েও দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য বেশি।

১৯৪০—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড : সুকুমার সেন।

পূর্বে বলেছি দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশের সময় থেকে বাঙালির ইতিবৃত্ত সাধনার প্রবাহে একটি নূতন ধারার সংগম ঘটেছে। তখন থেকে এই ধারার স্রোতও অবিরামগতিতেই এগিয়ে চলেছে। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই নবপ্রবাহের ভগীরথকেই শঙ্খধ্বনি করতে করতে এই স্রোতোধারাকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলতে হয়েছে। বস্তুতঃ দীনেশচন্দ্র তাঁর মৃত্যুকাল (১৯৩৯ নবেম্বর) পর্যন্ত এক্ষেত্রে

পথপ্রদর্শকের মর্যাদা অব্যাহত রেখে গেছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সংস্করণের পর সংস্করণে সংশোধিত ও পরিবর্ধিত রূপে আবির্ভূত হয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে প্রতি ধাপেই নবতর আলোকে প্রকাশিত করেছে। দীনেশচন্দ্রের জীবিতকালে বইখানির ছয়টি সংস্করণ হয়েছে। প্রথম সংস্করণ ১৮৯৬, দ্বিতীয় ১৯০১, তৃতীয় ১৯০৮, চতুর্থ ১৯২০ এবং পঞ্চম ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়। ষষ্ঠ সংস্করণের তারিখটা হাতের কাছে পেলাম না, তবে গ্রন্থকারের জীবিতকালেই তার প্রকাশ। এই সময়ের মধ্যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে এমন কোনো বই বেরোয়নি।

এই সময়ের মধ্যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের দুই ধারায় দুই জন মহারথের আবির্ভাব হয়। বাংলাভাষার ইতিহাস- তথা তার প্রকৃতি-নির্ণয়ের দিকে দীর্ঘকাল যাবৎই বাঙালি মনস্বীদের মন আকৃষ্ট হয়েছিল। নানা প্রবন্ধে ও পুস্তকে বাংলা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা প্রকাশ পাচ্ছিল বেশ প্রবল-ভাবেই। এক্ষেত্রে যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্র রায়, বসন্তরঞ্জন রায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। অবশেষে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর **Origin and Development of the Bengali Language** নামক দুইখণ্ড বৃহৎ গ্রন্থে (১৯২৬) বাংলা ভাষার ইতিহাসকে এমন সর্বাঙ্গীণ পরিণতি দিয়েছেন যা আগামী বহু বৎসর যাবৎ ভাষাতাত্ত্বিকদের

উপজীব্য হয়ে থাকবে। আর, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন গ্রহণ করেছে সুকুমার সেনের নাম। দীনেশচন্দ্রের মৃত্যুর পরের বছরই তাঁর গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের এতগুলি সংস্করণ প্রকাশের পরেও সুকুমার বাবুর গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে এত নূতন বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে যে, তাতে বিস্মিত হতে হয়। দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থের বহু গুণ আছে এবং আরও দীর্ঘকাল যাবৎ তার অবশ্যপাঠ্যতা অব্যাহত থাকবে। কিন্তু দীনেশচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা দুর্বলতা ছিল; তাঁর সাহিত্যিকসুলভ ভাবপ্রবণতা অনেক স্থলে ঐতিহাসিকের অনাসক্ত বস্তুনিষ্ঠতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এখানেই সুকুমার বাবুর কৃতিত্ব। তাঁর গ্রন্থে কালক্রমের পৌর্বাপর্য রক্ষা করে সাহিত্যের ইতিহাসকে জাতীয় ইতিহাসের ভূমিকার উপরে স্থাপনের প্রয়াস সুস্পষ্ট। এই হিসাবে বলা যায় সুকুমার বাবুর এই বৃহৎ গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় এক নূতন পর্যায়ের সূত্রপাত করেছে।

১৯৪২—**Bengali Literature :** অন্নদাশঙ্কর রায় এবং লীলা রায়।

ভারতীয় **P. E. N.** গ্রন্থমালার অন্তর্গত এই বইখানি আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও তার মূল্য কম নয়। বইখানি মূলতঃ অবাঙালির জন্য রচিত হলেও বাঙালি পাঠকের কাছে এই বইখানি পড়া অনাবশ্যক নয়। গ্রন্থটিতে অনধিক নব্বই পৃষ্ঠার

ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেই প্রাচীন কাল থেকে আধুনিকতম কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। পরিসরগত অল্পতাই এই গ্রন্থের একটি বিশেষ গুণ। দীনেশচন্দ্র বা সুকুমার সেনের বইএর আর যত গুণই থাক, তাঁদের বিশালকায় গ্রন্থ থেকে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক স্বরূপ উপলব্ধি করা সহজ নয়; তাঁদের গ্রন্থের অতিবিস্তারই বাংলা সাহিত্যকে সমগ্ররূপে উপলব্ধির অন্তরায়। কিন্তু আলোচ্যমান পুস্তকটি থেকে এক দৃষ্টিতেই সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক গতি ও প্রকৃতি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। অবাঙালি পাঠকের পক্ষে বস্তুসংক্ষেপের অন্য প্রয়োজন যাই থাক, বাঙালি পাঠকের পক্ষে স্বরূপতঃ উপলব্ধির জন্যই উক্ত সংক্ষেপণের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

এই পুস্তকখানিতে শুধু যে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক ধারাকেই সংক্ষেপে বিবৃত করা হয়েছে তা নয়। এই বিবৃতির মধ্যেই বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ উপলক্ষ্যে বাংলা সংস্কৃতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনেও গ্রন্থকার প্রয়াসী হয়েছেন। এই সংস্কৃতি বিশ্লেষণে তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেছেন তার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে অন্নদাশঙ্করের মতো চিন্তাশীল লেখকের অভিমত শ্রদ্ধাসহকারেই চিন্তনীয়। গ্রন্থের আয়তন, ইংরেজি ভাষা এবং অভিমতের চিন্তনীয়তা, এই সবদিক্ থেকেই বইখানিকে বঙ্কিমচন্দ্রের **Bengali Literature** (১৮৭১) এবং রমেশচন্দ্রের **The**

Literature of Bengal (১৮৭৭) -এর সঙ্গে তুলনা করা অসমীচীন নয়। অবশ্য এ কথা বলা বাহুল্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের অভিমতের সঙ্গে অন্নদাশঙ্করের অভিমতের ব্যবধান তাঁদের কালগত ব্যবধানেরই সমানুপাতিক।

১৯৪২—**Some Historical Aspects of the Inscriptons of Bengal**: বিনয়চন্দ্র সেন।

গ্রন্থের নামেই তার আলোচ্য বিষয়ের স্বরূপ সুস্পষ্ট পূর্বে একাধিকবার ইতিহাসের উপাদানগ্রন্থ প্রকাশের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছি। এপর্যন্ত অন্ততঃ তিনখানি আদর্শ উপাদানগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু উপাদানকে আশ্রয় করে সোজাসুজি যথার্থ ইতিহাস লেখা সম্ভব নয় কেননা, ঐতিহাসিক উপাদানের তাৎপর্য ব্যাখ্যাসাপেক্ষ; বহুস্থলেই ব্যাসকূটের ন্যায় ইতিহাসকূট দেখা দেয়, তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নানা সমস্যা ও তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়; সে-সব সমস্যার মীমাংসা ও তর্কবিতর্কের অবসান না হলে সরল সুখপাঠ্য ও ধারাবাহিক যথার্থ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয় সুতরাং বাংলার ইতিহাস সংগঠনের পর্যায়ে উপাদানগ্রন্থের ন্যায় আলোচনাগ্রন্থেরও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা ছিল। আলোচনা-গ্রন্থই ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার পথ সুগম করে দেয় বাংলার ইতিহাসের সোজাসুজি আলোচনাগ্রন্থ নেই বললেই হয়। ফলে ইতিহাস নামে যে-সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার সবগুলিকেই কূটসমস্যা ও তর্কবিতর্কের অরণ্যের মধ্যে

পথ কেটে অগ্রসর হতে হয়েছে। অর্থাৎ স্পষ্টতঃ স্বীকৃত না হলেও ওসব গ্রন্থ কার্যতঃ অনেকাংশেই আলোচনাগ্রন্থের রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু এই বৃহৎ গ্রন্থখানি স্পষ্টতই আলোচনাগ্রন্থ এবং এখানেই তার বিশেষ মর্যাদা। বস্তুতঃ এখানি বাংলার ইতিহাস রচনার জটিলতা মোচন করে ভাবী ঐতিহাসিকের সমস্যাভারকে বহুলাংশে লঘু করেছে। এখন পর্যন্ত এই বইখানির যথার্থ মূল্য নির্ণয়ের তথা যথোচিত সদ্ব্যবহারের সময় বা সুযোগ হয়নি। ভবিষ্যতেও এ ধরণের আলোচনাগ্রন্থের আবশ্যকতা আছে।

১৯৪৩—**History of Bengal**, প্রথম খণ্ড: রমেশচন্দ্র মজুমদার-সম্পাদিত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত।

বহু ঐতিহাসিকের সংঘবদ্ধ প্রয়াস ও প্রবীণ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্রের সম্পাদনার ফল এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি। বিলাতের **Cambridge History of India** প্রভৃতি গ্রন্থের আদর্শে রচিত। এখানিকেই বাংলার তুর্কিপূর্ব যুগের প্রথম সর্বাঙ্গীণ ও সম্পূর্ণ ইতিহাসের মর্যাদা দিতে হবে। প্রাচীন বাংলার রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার প্রথম সার্থক প্রয়াস হিসাবে এখানি দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাছাড়া আগামী বহু বৎসর ধরে এখানি বাংলার প্রামাণিক ইতিহাস এবং ভাবী ঐতিহাসিকদের আদর্শ বলে স্বীকৃত হবে এ কথা বলা কিছুমাত্র অসংগত হবে না। এই গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেকটি উক্তিই যথাযথ প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত। ফলে ভাবী সমালোচক, গবেষক ও

ঐতিহাসিকের পথ বিশেষভাবেই সুগম হয়েছে। বস্তুতঃ এই গ্রন্থপ্রকাশের দ্বারা বাংলার প্রাচীন তুর্কিপূর্ব যুগের তমসাচ্ছন্ন ইতিবৃত্ত প্রায় সমগ্ররূপেই আলোকিত তো হয়েইছে, অধিকন্তু যে-সব স্থলে সত্যনির্ণয়ের তথা আলোকপাতের আরও অবকাশ রয়েছে সে-সব স্থলেও ভাবী ঐতিহাসিকের কাজকে অনেকখানি সহজ করে দেওয়া হয়েছে। এক কথায় এই বইখানি যুগপৎ বাংলার দীর্ঘকালব্যাপী পুরাবৃত্তচর্চার পূর্ণ পরিণত ফল এবং ভাবী ঐতিহাসিকের পথপ্রদর্শক। আমরা পরে দেখব এই সুগঠিত ও প্রশস্ত পথে উৎসাহী অনুবর্তীর আগমন ঘটতে বিলম্ব হয়নি।

১৯৪৩—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড: সুকুমার সেন।

দীনেশচন্দ্র তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে ইংরেজি প্রভাবের পূর্ব পর্যন্ত এনেই সমাপ্ত করেছেন; ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল-প্রমুখ আধুনিক সাহিত্যিকদের কথা তাতে নেই। সুকুমারবাবুর গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তুও অনুরূপ; মোটামুটি বলা যায় যে, ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ধারা ওই খণ্ডে অনুসৃত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে তৎপরবর্তী যুগের অর্থাৎ ইংরেজিপ্রভাবযুক্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস দেওয়া হয়েছে; রঙ্গলাল, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ সাহিত্যিকদের কীর্তিসম্পদের পরিচয় আছে এই খণ্ডে। এই খণ্ডেও আধুনিক কালের ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই যুগের সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় এই বইটিকেই প্রথম স্থান দিতে

হয়। কেননা, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এ-রকম ধারাবাহিক ইতিহাস আর কোনো গ্রন্থেই নেই।

এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-প্রকাশিত 'সাহিত্যসাধক-চরিতমালা'র উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। এই চরিতমালার প্রকাশ আরম্ভ হয় ১৯৪০ সালে এবং এখনও তার প্রকাশের ধারা চলেছে। এই গ্রন্থমালায় ঊনবিংশ শতকের প্রথম থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সব সাহিত্যিকেরই জীবনচরিত ও সাহিত্যসাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। ফলে এই গ্রন্থগুলি একাধারে বাংলা সাহিত্যের তথা বাঙালির জাতীয় জীবনের ঐতিহাসিক উপাদানের অতি চমৎকার এক সংগ্রহশালার রূপ ধারণ করেছে। আধুনিক বাংলার জাতীয় জীবন তথা তার সাহিত্যিকের পক্ষে এই গ্রন্থমালা অমূল্য সম্পদ্। এই গ্রন্থমালার অধিকাংশ গ্রন্থই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত এবং এই গ্রন্থমালা প্রকাশের কৃতিত্বও তাঁরই। আধুনিক বাংলার ভাবী ঐতিহাসিকের জন্য তিনি যে সম্পদ্ সংগ্রহ করেছেন তার ঋণ অপরিশোধনীয়। এই গ্রন্থমালাই উক্ত সম্পদের একমাত্র আধার নয়। ব্রজেন্দ্রনাথের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'ও (প্রথম খণ্ড ১৯৩২, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩৩, তৃতীয় খণ্ড ১৯৩৫; প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৩৭, দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪২) বাংলা দেশের ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের (বিশেষতঃ ১৯১৮-১৯৪০ সালের) শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সমস্ত বিষয়ের

ইতিহাসরচয়িতার পক্ষে একটি অমূল্য উপকরণগ্রন্থ। গৌড়লেখ-মালা, Inscriptions of Bengal, রামচরিতম্ প্রভৃতির পাশেই 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র স্থান।

১৯৪৩—প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী; সুকুমার সেন।

সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় গ্রন্থকার জানিয়েছেন,—"এই বইয়ে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা দেশের রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও সাংসারিক জীবনের পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে উপযুক্ত উপাদানের অভাবে এই পরিচয় সর্বাঙ্গীণ নয়। তবে কল্পনার সাহায্যে অবান্তর ও অমূলক সম্পূর্ণতা দিয়ে ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত করা বা অতথ্যকে তথ্য প্রতিপন্ন করা হয়নি এর প্রত্যেকটি কথাই যথার্থ। বাংলার ইতিহাস বিষয়ে বোধ করি এখানিই সব চেয়ে ছোট বই, মাত্র ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠা। অথচ এমন মূল্যবান্ পুস্তকও বাংলা ভাষায় বিরল। এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে এত নূতন নূতন ও বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ হয়েছে যে বিস্মিত হতে হয়। কোথাও কিছুমাত্র বাগ্‌বিস্তার বা ব্যাখ্যার লেশমাত্রও নেই। সর্বত্রই ছাঁকা তথ্যের সমাবেশ। এমন ঐকান্তিক তথ্যনিষ্ঠতা এদেশে বিরল। বইখানি পড়তে পড়তে আক্ষেপ হয়, যদি এটিতে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা ও সম্পূর্ণতা থাকত। কিন্তু তার জন্য গ্রন্থকারকে দায়ী করা যায় না। বাংলা সাহিত্যের তিনখণ্ড-ব্যাপী বৃহৎ ইতিবৃত্ত রচয়িতার দক্ষ হাত থেকে এই ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থিকা পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি মনে পড়ে—"যে দাতা মনে করিলে অর্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে,

সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে। মুষ্টিভিক্ষা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি।" যিনি বাংলা সাহিত্যের বিরাট্ ইতিহাস রচনা করে জাতীয় জীবনে একটি কীর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি স্বদেশেরও অনুরূপ বৃহৎ ইতিহাস রচনা করে দ্বিতীয় কীর্তি স্থাপন করবেন, এ আশা কি একান্তই দুরাশা? সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনি সর্বত্রই যে-ভাবে জাতীয় ইতিবৃত্তের ভূমিকার উপরে স্থাপন করেছেন তাতে এই আশা পোষণ করতে উৎসাহিত হয়েছি। বস্তুতঃ তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের প্রথমাংশে যে ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় পাই, তারই অন্যতম ফল এই 'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী' পুস্তিকা। তাঁর সাহিত্যের বৃহৎ ইতিহাস ও দেশের এই ক্ষুদ্র ইতিহাস, এ দুখানিই পরবর্তী কালে বাংলার ইতিহাস রচনায় প্রচুর কাজে লেগেছে। তার প্রমাণ নীহাররঞ্জনের বৃহৎ বাঙালীর ইতিহাস গ্রন্থের বহু স্থলেই পাওয়া যাবে। অতঃপর সুকুমারবাবু যদি বাংলা দেশের সাধারণ ইতিবৃত্ত রচনায় হাত দেন তাহলে আমাদের ইতিহাস-সাহিত্য যে সমৃদ্ধতর হবে তাতে সন্দেহমাত্র নেই।

১৯৪৫—মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : সুকুমার সেন।

এই বইখানি আয়তনে ও উৎকর্ষে 'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী' বইটির সগোত্র, এবং এই শেষোক্ত বইটির সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছি, এই বইটি সম্পর্কেও সে অভিমতই অনেকাংশে প্রযোজ্য। অধিকন্তু এ কথা বলা যায় যে, 'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী' পড়ে মনে যে অতৃপ্তি থেকে যায়, 'মধ্যযুগের বাংলা ও

বাঙালী' পড়ে সে অতৃপ্তি আরও বেশি করেই অনুভূত হয় কেননা, প্রাচীন বাংলার সামাজিক ও সাংসারিক জীবনে ঐতিহাসিক উপাদান সম্পর্কে যে বিরলতা সর্বজ্ঞাত, মধ্যযুগে বাংলা সম্পর্কে ততখানি বিরলতার অভিযোগ আনা যায় না বস্তুতঃ মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনার যথোচি প্রয়াস আজ পর্যন্তও হয়নি ; কিন্তু তাহলেও একথা কিছুতে সত্য নয় যে, ওই ইতিহাসের উপকরণগত বিরলতাই তার হেতু বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্য প্রভৃতি নানা উৎস থেকে উপকর সংগ্রহ করে মধ্যযুগের একখানি বৃহৎ সামাজিক ইতিহাস রচ সম্ভবপর এবং একান্তভাবে বাঞ্ছিত। তাই অগ্নিতে ঘৃতবিন্দুপাতে মতোই এই একান্ন পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র ইতিহাস পাঠে আমাদের ইতিহা ক্ষুধা অধিকতর তেজেই প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে সুবৃহৎ ইতিহাসলেখক সুকুমার বাবুর কাছেই বাংলা দেশ মধ যুগের বাংলার একখানি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ইতিহাস প্রত্যাশ করে।

১৯৪৬—বাংলাদেশের ইতিহাস : রমেশচন্দ্র মজুমদার।

পূর্বে বলেছি রাখালদাসের বাঙ্গালার ইতিহাস বিশেষজ্ঞে পক্ষে অতি মূল্যবান্ হলেও সাধারণের পক্ষে সুপাঠ্য নয়। ছাড়া এই গ্রন্থে শুধু রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্তের কাঠামো গড়বার চেষ্টা আছে, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় নেই। ঢা বিশ্ববিদ্যালয়ের **History of Bengal** প্রথম খণ্ডে বাংলা ধারাবাহিক সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস আছে বটে, কিন্তু ওই বৃহৎ গ্র

সাধারণ পাঠকের অধিগম্য নয়, যাঁরা শুধু বাংলা পড়েন তাঁদের পক্ষে তো নয়ই। বাংলা ভাষায় অল্প পরিসরের মধ্যে বাংলার সর্বাঙ্গীণ ও সুখপাঠ্য একখানি ইতিহাস পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে রমেশচন্দ্রের এই বাংলা বইটির দ্বারা। এই বইএ তুর্কিপূর্ব বাংলার রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস সরল ভাষায় ধারাবাহিকভাবে লিখিত হয়েছে।

১৯৪৬—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড : সুকুমার সেন।

এই গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রযুগের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। সুকুমারবাবুর এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড যেমন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত হিসাবে অদ্বিতীয়, এই তৃতীয় খণ্ডখানিও তেমনি রবীন্দ্রযুগের সাহিত্যিক ইতিবৃত্ত হিসাবে অদ্বিতীয় বললে অন্যায় হয় না।

এই প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী'ও (প্রথম খণ্ড ১৯৩৩, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩৬ ; দ্বিতীয় সংস্করণ—প্রথম খণ্ড ১৯৪৬, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৪৮, তৃতীয় খণ্ড ১৯৫২) স্মরণীয়। এই গ্রন্থখানি যদিও মুখ্যতঃ রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত তথাপি সমকালীন বাংলার সাহিত্যিক ও জাতীয় জীবনের ইতিবৃত্ত রচনার পক্ষেও এর প্রচুর মূল্যবত্তা আছে। শান্তা দেবী-প্রণীত 'ভারতমুক্তি-সাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা' (১৯৪৫ ?) বইখানিও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) এবং রামানন্দ (১৮৬৫-১৯৪৩) প্রায় সমকালীন। সুতরাং উভয়ের

জীবনচরিত পরস্পরের পরিপূরক; এবং এই দুইখানি জীবন-চরিতও আধুনিককালীন বাংলার ইতিহাসের দুইখানি মূল্যবান্ আকরগ্রন্থ হিসাবে আদৃত হবার যোগ্য।

১৯৪৮—**Bengali Literature : J. C. Ghosh**

এই নাতিবৃহৎ (১৮৮ পৃষ্ঠা) গ্রন্থখানিতে বাংলা সাহিত্যের ধারা উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত অনুসৃত হয়েছে। বিংশ শতকের সাহিত্যের পরিচয় নেই এ গ্রন্থে, তবে একটি অধ্যায়ে রবীন্দ্রসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাতে সাহিত্যকে জাতীয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়নি; জাতীয় সাহিত্যকে জাতীয় জীবনেরই প্রকাশরূপে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। পূর্ববর্তী গ্রন্থকাররা যে এবিষয়ে অনবহিত ছিলেন তা নয়। তবে জীবন ও সাহিত্যের একাত্মতা স্থাপনের প্রয়াস বোধ করি এই গ্রন্থেই সবচেয়ে বেশি অগ্রসর হয়েছে। বইএর ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখেছেন—

In dealing with literature I have paid special attention to the religious movements, and the political and social forces, to which it was related.

এই হিসাবে গ্রন্থখানিকে শুধু বাংলা সাহিত্যের নয়, বাঙালির জাতীয় জীবনেরও ইতিহাস বলে স্বীকার করা যায়। এখানেই গ্রন্থখানির বিশেষ মূল্যবত্তা।

সাহিত্যের ইতিহাস হিসাবেও গ্রন্থখানিকে বিশিষ্টতার

অধিকারী বলেই মনে করি। অনাবশ্যক বাহুল্যবর্জিত অনতিবিস্তার গ্রন্থখানির একটি বিশেষ গুণ। পরিমিত আয়তনের ফলে শুধু যে তার নিত্যব্যবহার্যতা বেড়েছে তা নয়, সুখগ্রাহ্য পরিধির মধ্যে গোচরীভূত হবার ফলে বাংলা সাহিত্যকে সমগ্রতঃ এবং স্বরূপতঃ বোঝবার পক্ষেও সহায়তা হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি ব্যাখ্যাতেও গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গির বিশিষ্টতা সুস্পষ্ট। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের সঙ্গে মতপার্থক্য অনুভূত হতে পারে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর অভিমত উপেক্ষণীয় নয়, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রদ্ধা সহকারে বিবেচ্য। মোটের উপর একথা বলা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের যে চার-পাঁচখানি ইতিহাস ইংরেজিতে লেখা হয়েছে তার মধ্যে এখানির উপযোগিতাই সব চেয়ে বেশি। অবাঙালি পাঠকের পক্ষে তো বটেই, বাঙালি পাঠকের পক্ষেও। কেননা, বাংলা ভাষাতে অনুরূপ আয়তনের মধ্যে এ-রকম বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা একখানি বইএর অভাব রয়েছে এখন পর্যন্ত। অবশ্য একথা বলা আমার অভিপ্রায় নয় যে, বইখানিতে ত্রুটিবিচ্যুতি বা ভুলচুক কিছুই নেই। এ-রকম নির্দোষ বই প্রত্যাশা করাই অসমীচীন। বস্তুতঃ সমালোচকরা এই বইএর ভুলচুক অনেকেই দেখিয়েছেন। তথাপি আমার বক্তব্য এই যে, তা সত্ত্বেও বাঙালি এবং অবাঙালি সাধারণ পাঠকের পক্ষে এর উপযোগিতা এবং বিশেষজ্ঞদের কাছে এই গ্রন্থোক্ত অভিমতাদির চিন্তনীয়তা অবশ্যস্বীকার্য।

বাংলা সাহিত্যের সব চেয়ে গৌরবের যুগ হচ্ছে বিংশ শতক অথচ এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ওই শতকের আর সব লেখকের কথাই বর্জিত হয়েছে। তাতে এর অপূর্ণতা ঘটেছে সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে সমকালীন সাহিত্যের পরিচয় দেবার বিপদ্‌ও আছে। অত্যাসন্নতার ফলে রাগদ্বেষহীন যথানুপাতিক দৃষ্টিতে দেখার অন্তরায় ঘটে। তাই লেখক অপূর্ণতার ত্রুটি স্বীকার করেই রাগদ্বেষের অপরাধে অভিযুক্ত হবার বিপদ্‌ অনেকাংশে এড়িয়ে গেছেন। এ বিষয়ে অন্নদাশঙ্কর ও লীলা রায়ের (**Bengali Literature**, ১৯৪৩) ভাগ্য হয়েছে অন্য রকম। আধুনিকতম সাহিত্যের পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁদের ক্ষুরধার পথের উপর দিয়ে সঞ্চরণ করতে হয়েছে, এবং সে পথে চলতে গিয়ে তাঁদের যে রাগদ্বেষের অভিযোগে তীক্ষ্ণ সমালোচনার আঘাত সহ্য করতে হয়েছে, তা অপ্রত্যাশিত নয়। আলোচ্যমান গ্রন্থের লেখককে এই প্রত্যাশিত তীক্ষ্ণতার সম্মুখীন হতে হয়নি।

১৯৪৮—**History of Bengal**, দ্বিতীয় খণ্ড: যদুনাথ সরকার-সম্পাদিত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত।

এই গ্রন্থে তুর্কি-আক্রমণকাল থেকে পলাশির যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলার ইতিবৃত্ত সংকলিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডটিও একটি লেখকসংঘের সমবেত প্রয়াসের ফল। তথাপি স্বীকার করতে হবে যে, ঐতিহাসিকশ্রেষ্ঠ যদুনাথের অদম্য উদ্যম এবং অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যতীত এই গ্রন্থ প্রকাশ কখনও সম্ভব হত না। কারণ অষ্টাদশ শতকের শেষাংশ থেকে প্রায় দেড় শো বছর ধরে বাংলার তুর্কি-

পূর্ব যুগের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে যত গবেষণা-আলোচনা হয়েছে, তার তুলনায় মধ্যযুগের ইতিবৃত্তের আলোচনা অতি অল্পই হয়েছে। আরবি-ফারসি ভাষায় অভিজ্ঞ গবেষকের অভাব প্রভৃতি নানা কারণে এই যুগের ইতিবৃত্ত এতদিন পর্যন্ত তমসাচ্ছন্ন ছিল বললেই হয়। কয়েকজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক এবং রাখালদাস, নলিনীকান্ত-প্রমুখ কয়েকজন বাঙালি এ ক্ষেত্রে যে কাজ করেছেন প্রয়োজনের তুলনায় তা অতি সামান্য। তাই মধ্যযুগীয় ইতিহাসের দিক্‌পাল যদুনাথের প্রেরণা না থাকলে বাংলার ইতিহাসের এই খণ্ডটি হয় প্রকাশিতই হতে পারত না, না-হয় তাতে বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেত। বস্তুতঃ এই গ্রন্থের অধিকাংশই যদুনাথের রচনা এবং তাঁর সংগৃহীত উপকরণের দ্বারা সমৃদ্ধ। এ ক্ষেত্রে তিনি একাই একটি সংঘের কাজ করেছেন বললে কিছুমাত্র অসংগত হয় না। বাংলার মধ্যযুগের এই ইতিবৃত্তসংগঠনে তাঁর এই অসামান্য কৃতিত্ব দীর্ঘকাল ভাবী ঐতিহাসিকদের আদর্শ হয়ে থাকবে। যাহোক, এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের সঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ডের একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। প্রথম খণ্ডে রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্তের সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ও যথোচিত অনুপাতেই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডে আছে শুধু রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্ত; যোগ্য ঐতিহাসিকের অভাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্ত দেওয়া সম্ভব হয়নি। বাঙালির ইতিহাসের এই গুরুতর অভাব পূরণের দায়িত্ব ভাবী ঐতিহাসিকের অপেক্ষায় রইল। মধ্যযুগের বাংলার জাতীয় জীবনের ইতিবৃত্তের এই অভাবটা পূর্ণ না হলে আমাদের

ভাবী জাতীয় জীবনও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা পেতে পারবে না, এ কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

আরও একটা অভাবের কথা এস্থলে বলা প্রয়োজন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত ও ইংরেজি ভাষায় রচিত বৃহৎ বাংলার ইতিহাস প্রথম খণ্ডের পরিপূরক গ্রন্থ হিসাবে স্বয়ং রমেশচন্দ্র বাংলা ভাষায় ও অল্প পরিসরের মধ্যে একখানি 'বাংলাদেশের ইতিহাস' লিখে সাধারণ বাঙালি পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। আমরা স্বয়ং যদুনাথের কাছেই তাঁর সম্পাদিত বৃহৎ ইংরেজি বইখানির অনুরূপ একটি বাংলা পরিপূরক গ্রন্থ আশা করতে পারি না কি? এ-রকম একটি বই লিখিত হলে তাঁর বাংলা 'শিবাজী'র মতোই বাংলা সাহিত্যের একটি সম্পদ্ বলে গণ্য হবে।

যাহোক, দীর্ঘকালের পুরাবৃত্তসাধনার ফলে আমরা বাংলার প্রাচীন যুগের পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত (রমেশচন্দ্র-সম্পাদিত **History of Bengal** প্রথম খণ্ড, ১৯৪৩) এবং মধ্যযুগের (১২০০-১৭৫৭) অর্ধাঙ্গ ইতিবৃত্ত (যদুনাথ-সম্পাদিত **History of Bengal** দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৪৮) পেলাম। কিন্তু আধুনিক যুগের (১৭৫৭-১৯৫২) বাংলার ইতিহাস এখনও অলিখিত রয়েছে। এই ইতিবৃত্ত রচিত না হওয়া পর্যন্ত জাতিগতভাবে আমাদের পিতৃঋণ পরিশোধ হবে না।

১৯৫০—বঙ্গীয় ইতিহাস-পরিষদ্ ও 'ইতিহাস' পত্রিকা।

আমরা দেখেছি অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে এশিআটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল (১৭৮৪) এবং তার মুখপত্রখানি

বাংলার ইতিহাস উদ্ধারে ও রচনায় প্রচুর সহায়তা করে আসছে। কিন্তু এই সোসাইটি বাঙালির স্বকীয় প্রতিষ্ঠান নয়, সেখানে বাঙালির স্বাধীন চেষ্টার অবকাশ ছিল না। এই স্বাধীন চেষ্টার সূত্রপাত হয় দীর্ঘকাল পরে ১৮৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন পত্রিকাকে আশ্রয় করে। অতঃপর প্রচার, ভারতী, সাধনা প্রভৃতি সাহিত্যপত্রিকাকে আশ্রয় করেই ইতিবৃত্তসাধনা বিকশিত হতে থাকে। তখন পর্যন্ত বাঙালির জ্ঞানসাধনা সংঘবদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু সংগঠনের অভিপ্রায় যে বাঙালির মনে দানা বেঁধে উঠছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই ১৮৯৪ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ প্রতিষ্ঠার মধ্যে। এই পরিষদ্ ও তার মুখপত্রিকাখানি সে সময় থেকে শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, বাংলার ইতিহাস উদ্ধারেও কম সহায়তা করেনি। কিন্তু তার ইতিহাস-সাধনা একনিষ্ঠ নয়। তাই একমাত্র ইতিহাসচর্চার লক্ষ্য নিয়ে ১৮৯৯ সালে ত্রৈমাসিক 'ঐতিহাসিক চিত্র' প্রকাশিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা এবং অক্ষয়কুমার ও নিখিলনাথের উদ্যম সত্ত্বেও পত্রিকাখানি দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারেনি, কারণ তখনও বাঙালির মনে ইতিহাস-জিজ্ঞাসা যথোচিত পরিমাণে দেখা দেয়নি। বিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে বড়লাট কারজনের উৎসাহে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগটি স্থায়ী ও সক্রিয় ভাবে পুনর্গঠিত হবার (১৯০২) ফলে ভারতবর্ষের তথা বাংলা দেশের প্রত্নসম্পদ্ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং ইতিহাস সংকলনের একটি নূতন সুযোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু তাতে বাঙালির তথা

ভারতীয়ের প্রতিভাবিকাশের যথেষ্ট প্রেরণা বা স্বাধীনতা ছিল না। অতঃপর ১৯০৭ সালে ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি ও তার মুখপত্র **Bengal Past and Present** এই ক্ষেত্রে পদার্পণ করে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানেও বাঙালির স্বাধীন চেষ্টার অবকাশ ছিল না। ঠিক এই সময়েই কারজনী বঙ্গবিভাগের ফলে নবজাগ্রত বাঙালির হৃদয়ে ইতিহাসক্ষুধা প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। তখন দেশে যে-সব ইতিহাসপ্রচেষ্টা দেখা দেয় তারই অন্যতম পরিণতিস্বরূপ ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় রাজসাহির বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি। এই সময় থেকে বাঙালির মনে যে পুরাবৃত্তস্পৃহা ক্রমবর্ধিষ্ণু হয়ে ওঠে তার ফল বাংলার সাহিত্যপত্রিকাগুলিতে বিকীর্ণ হয়ে আছে অজস্র প্রবন্ধের আকারে। কোনো সুপরিকল্পিত ইতিহাসপত্রিকা না থাকাতে সেগুলি একত্র সংহত রূপে প্রকাশ পেতে পারেনি। অতঃপর বাঙালির ইতিহাসপ্রচেষ্টা অনেকাংশে কেন্দ্রীভূত হয় কলকাতা ও ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয় দুটিতে। আর, তখন থেকেই ইতিহাস-গবেষণার বাহনরূপে বাংলা ভাষা ইংরেজির প্রভাবে অনেক পরিমাণে স্বস্থানচ্যুত হয়ে যায়। গবেষণাগ্রন্থাদিও প্রধানতঃ ইংরেজিতেই রচিত হতে থাকে। এই গবেষণার যোগ্য মুখপত্র প্রকাশিত হতেও বিলম্ব হল না। ১৯২৫ সাল থেকে নরেন্দ্রনাথ লাহার সম্পাদনায় প্রকাশিত **Indian Historical Quarterly** পত্রিকা ইংরেজি গবেষণার বাহনরূপে বেঙ্গল এশিআটিক সোসাইটির পত্রিকার পাশে স্থান গ্রহণ করল। অতঃপর ১৯৩৪

সাল থেকে **Indian Research Institute**এর মুখপত্ররূপে ত্রৈমাসিক **Indian Culture** প্রকাশিত হতে থাকে। পূর্বোক্ত প্রমোদলাল পাল-প্রণীত **Early History of Bengal** দুই খণ্ড (১৯৩৯-৪০) এই প্রতিষ্ঠান থেকেই প্রকাশিত হয়। ইতিহাস-গবেষণার বাহনরূপে ইংরেজির এই অভ্যুদয় সত্ত্বেও বাংলা ভাষা তার সুচিরলব্ধ প্রতিষ্ঠাভূমি থেকে সম্পূর্ণ নিরস্ত হয়নি, বরং ইংরেজির প্রতিযোগিতায় বাংলার মাধ্যমে উক্ত গবেষণার মান ও শক্তি অনেক পরিমাণেই বৃদ্ধি পেতে থাকল। তারই ফলে ১৯৫০ সালে একান্তভাবে বাংলা ভাষার যোগে ইতিবৃত্তচর্চার অভিপ্রায়ে বঙ্গীয় ইতিহাস-পরিষদ্ ও তার মুখপত্র ত্রৈমাসিক 'ইতিহাস'এর আবির্ভাব হয়। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ ও পরিষৎ-পত্রিকার প্রায় ছাপ্পান্ন বছর পরে এই ইতিহাস-পরিষদ্ ও ইতিহাসপত্রিকার আবির্ভাবের দ্বারা সূচিত হচ্ছে, বিগত অর্ধ শতকের মধ্যে বাংলা দেশে ইতিহাসচেতনা ও ইতিহাসচর্চা কতখানি অগ্রসর হয়েছে এবং তার বাহন হিসাবে বাংলা ভাষাও কতখানি যোগ্যতা অর্জন করেছে। ইদানীং কালে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের অনুপূরক রূপে বিজ্ঞান-পরিষদ্ ও ইতিহাস-পরিষদ্ প্রতিষ্ঠার দ্বারা বাঙালি জাতির ভাবী কল্যাণের পাদপীঠ শুভক্ষণেই স্থাপিত হল, এই আশা বোধ করি অসমীচীন নয়। আচার্য যদুনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় ও মনস্বী রমেশচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় প্রতিষ্ঠিত উক্ত ইতিহাস-পরিষদের অভিপ্রায় ও কর্মপদ্ধতি সুস্পষ্ট ভাষায় ও অসন্দিগ্ধচিত্তেই বর্ণিত হয়েছে।

"ব্যক্তিগত সংস্কার, জাতিগত স্বার্থ এবং ভাবগত আবেগের ঊর্ধ্বে উঠিয়া তপস্বীর শ্রদ্ধা ও ধৈর্য লইয়া ইতিহাসের তথ্য অনুসন্ধান করা; নিরপেক্ষ, নির্মোহ ও অখণ্ড দৃষ্টির আলোকে ঐ তথ্য পরীক্ষা করা; মাতৃভাষার মাধ্যমে সেই পরীক্ষিত ও প্রমাণিত তথ্যকে জনসাধারণের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করা"—এই তিনটি উদ্দেশ্য নিয়ে পরিষদ্ স্থাপিত হয়েছে। বলা বাহুল্য এর চেয়ে মহত্তর বা পূর্ণতর কোনো অভিপ্রায় হতে পারত না। কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে,—"এই পরিষদ্ বাংলা ভাষার মাধ্যমে ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা, ঐতিহাসিক সত্য প্রচার এবং ঐতিহাসিক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের মনে ইতিহাস বিষয়ে অনুরাগ সঞ্চারে প্রয়াসী হইবে। এতদ্‌ব্যতীত এই পরিষদ্ ঐতিহাসিক গবেষণার উৎসাহ জোগাইবে এবং সার্থক গবেষণা মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রচার করিতে যত্নবান্ হইবে। সমাজের সকল স্তরে যাহাতে ঐতিহাসিক সচেতনতা জাগ্রত হয়, তাহার জন্য এই পরিষদ্ সর্ববিধ উপায়ে চেষ্টিত হইবে।" এই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতি অনুসারে পরিষদের মহৎ অভিপ্রায় যে পরিমাণে সিদ্ধ হতে থাকবে সেই পরিমাণেই বাঙালির ভাবী ভাগ্য উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। কেননা "যে-সকল জাতি ভাগ্যবান্ তাহারা ইতিহাসের মধ্য দিয়াই স্ব-রূপ উপলব্ধি করে ও বিভিন্ন দেশকাল হইতে বিচিত্র রসধারা আহরণ করিয়া আপনার সৃষ্টিপ্রতিভাকে নিরন্তর সঞ্জীবিত" রাখে। বাঙালি জাতি এই

সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারেনি। উক্ত নবগঠিত ইতিহাস-পরিষদ্ যদি বাঙালি জাতিকে সেই অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তাহলেই আমাদের প্রায় পাদোনশতাব্দীব্যাপী ইতিবৃত্ত-সাধনা যথার্থ সিদ্ধিলাভের পথে পদার্পণ করবে।

বস্তুতঃ এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই জাতিগত ভাবে বাঙালির ইতিহাসচেতনা সংহত হবার প্রথম সুযোগ পেল। যেদিন তার কার্যকলাপের মধ্যে ওই চেতনার মূর্তপ্রকাশ ঘটবে, সেদিনই আমাদের জাতীয় প্রতিভা চিরন্তনতার ধ্রুব আশ্রয় পেয়ে সার্থকতা লাভ করবে।

৯

বাংলার ইতিহাসচর্চার শেষরূপ

১৯৫০—বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব : নীহাররঞ্জন রায়।

এটি বাংলার প্রাচীন ইতিবৃত্তবিষয়ক শেষ বই এবং বাঙালির ইতিবৃত্ত সাধনার চরম পরিণতিও ঘটেছে এটিতেই। নিছক আয়তনের বিচারেও এই বইখানি বাংলার ইতিহাসবিষয়ক অন্য সমস্ত বইকে ছাড়িয়ে গেছে; বাংলা দেশের শুধু তুর্কিপূর্ব যুগের ইতিবৃত্ত নিয়ে যে প্রায় হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হতে পারে, একথা অল্পকাল পূর্বেও কেউ কল্পনা করতে পারেনি। শুধু আকৃতির বিচারে নয়, প্রকৃতির বিচারেও এই বইখানিকেই প্রথম স্থান দিতে হবে। কেননা, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, আলোচনার বিস্তারে এবং দৃষ্টির গভীরতায় আর কোনো বই

এর সঙ্গে তুলনীয় নয়, একথা বলা অসংগত হবে না। সুতরাং বইটি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা আবশ্যক। এতক্ষণ পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস উদ্ধার ও রচনার ধারাবাহিক পরিচয় দেবারই চেষ্টা করেছি; ইতিহাস রচনার অভিপ্রায়, আদর্শ ও রীতি-পদ্ধতির বিবর্তন সম্পর্কে কোনো আলোচনা করিনি। এই গ্রন্থের আলোচনাপ্রসঙ্গেই উক্ত বিবর্তনেরও কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করা যাবে।

গ্রন্থখানির স্থান

১৭৮৪ সালে এশিআটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল প্রতিষ্ঠায় যে পুরাবৃত্ত-নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল, অনেক

আঁধার গুহায় ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
গভীর গুহায় নামিয়া নামিয়া,

অনেক পাষাণকারা ভেঙে ও তটিনীর রূপে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে সে তার স্রোতোধারা ঢেলে দিয়েছে 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' নামক এই মহাসাগরের মোহানায়। সেই তুষারগলা নির্ঝরের প্রাথমিক ক্ষীণ স্রোতোধারা যে কখনও এমন বিপুলায়তন প্রবাহের আকার ধারণ করবে, এ কথা সেই স্বপ্নভঙ্গের যুগে কল্পনার অতীত ছিল। অন্ততঃ পক্ষে বাংলার ইতিবৃত্ত সম্পর্কে সেই কল্পনাতীতও সত্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এশিআটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার দ্বারা যে পুরাবৃত্তচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল বাংলার প্রাচীন যুগের ইতিহাসরূপে তার পরিণতি ঘটতে যে

দীর্ঘ সময় লাগল তাও তৎকালীন প্রত্যাশার অতীত। ১৮১৩ সালে বাংলার মধ্যযুগের ইতিবৃত্তকার চার্লস স্টুআর্ট আশা করেছিলেন যে, **from the pure mine of Sanskrit literature** বাংলার তুর্কিপূর্ব যুগের একখানি ইতিবৃত্ত রচিত হতে বেশি বিলম্ব হবে না। কত বিলম্ব হল তা রাখালদাসের বাঙ্গালার ইতিহাস (১৯১৫), রমেশচন্দ্র-সম্পাদিত **History of Bengal** (১৯৪৩) এবং নীহাররঞ্জনের বাঙ্গালীর ইতিহাস (১৯৫০) বইগুলির তারিখ স্মরণ করলেই বোঝা যাবে। বস্তুতঃ উইলকিন্‌স্‌, জোন্‌স্‌, কোলব্রুক প্রভৃতি বিদেশী মনীষীরা যে পুরাবৃত্তচর্চার প্রবর্তন করেন অষ্টাদশ শতকের নবম দশকে, তার পূর্ণ পরিণত ফল এই বাঙ্গালীর ইতিহাস। একাধিক অর্থেই একথা সত্য।

ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজত্বের অবসান হয়েছে। কিন্তু তাঁরা আমাদের এমন একটা অমূল্য সম্পদ্ দিয়ে গেছেন যার ক্ষয় নেই, সে আমাদের চোখের দৃষ্টি। দৃষ্টিদানের চেয়ে বড় দান আর কি হতে পারে? বিশেষতঃ সে দৃষ্টি যদি হয় আত্মদৃষ্টি। এই আত্মদর্শনেরই অন্যতম ফল বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন। বাঙালির আত্মদর্শন মানেই বঙ্গদর্শন। জাতীয় আত্মদর্শনেরই নামান্তর ইতিহাস। তাই তো বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ইতিহাস উদ্ধারের জন্য এমন আবেগ সহকারে সবাইকে আহ্বান করেছিলেন। তিনি নিজেই বাঙালির ইতিবৃত্তরচনার পথ নির্মাণের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন এবং মৃত্যুকাল (১৮৯৪) পর্যন্ত ওই পথে সেনাপতিদের আগমনবার্তার প্রতীক্ষা

করছিলেন। আমরা দেখেছি অতঃপর ওই পথে ইতিহাস-সেনাপতিদের আবির্ভাব ঘটতে আর বিলম্ব হয়নি। দীনেশচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, রমাপ্রসাদ, রাখালদাস, রমেশচন্দ্র, যদুনাথ-প্রমুখ সেনাপতিদের জীবনব্যাপী সংগ্রামের ফলে বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিবৃত্তরাজ্য কিঞ্চিদধিক অর্ধশতাব্দীর মধ্যে প্রায় সমগ্র ভাবেই অধিকৃত হয়েছে। এই দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামলব্ধ ইতিবৃত্তরাজ্যের প্রাচীন বিভাগে অবশেষে সগর্বে ও দৃঢ়হস্তে বিজয়-পতাকা উত্তোলন করলেন নীহাররঞ্জন। বাংলার ইতিবৃত্ত-উদ্ধারের ইতিহাসে এইখানেই তাঁর স্থান।

এক কথায় উইলকিন্‌স্‌-জোন্‌স্‌-কোলব্রুক-প্রমুখ বিদেশী মনস্বী-দের জ্ঞানাভিযান, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা, রাজেন্দ্রলাল-হরপ্রসাদের গবেষণা এবং অক্ষয়কুমার-রাখালদাস-রমেশচন্দ্র প্রভৃতির সাধনার ফল পরিণতি লাভ করেছে নীহাররঞ্জনের বাঙ্গালীর ইতিহাসে। বস্তুতঃ এই মহাগ্রন্থখানি বাংলার পুরাবৃত্ত-চর্চার ইতিহাসে একটি মহাযুগের অবসান এবং আর-একটি মহা-যুগের আবির্ভাবের সূচনাস্থান। ১৭৮৪ সালে যে পুরাবৃত্তচর্চার আরম্ভ, দেড় শো বছরের অধিককাল পরে ১৯৫০ সালে এই বিরাট্ গ্রন্থে তার পরিণতি। কিন্তু এই পরিণতির সঙ্গে সঙ্গেই এই গ্রন্থে আগামী কালের ইতিহাস-সাধনার মহাসম্ভাব্যতার বীজও অঙ্কুরিত হয়েছে। এই উক্তির তাৎপর্য একটু পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন।

ইতিবৃত্ত ও ইতিহাস

সংস্কৃত সাহিত্যে 'ইতিহাস' শব্দের ব্যাখ্যা পাই দুই স্থানে। কুল্লুকভট্ট তাঁর মনুসংহিতার (৩।২৩২) টীকায় ইতিহাস শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যা উপলক্ষে এই শ্লোকটি উদ্‌ধৃত করেছেন,—

ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে ॥

এই শ্লোকটি কার রচনা জানি না। কিন্তু কুল্লুকভট্টের সময়ে (সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতক) ইতিহাস শব্দটি কত ব্যাপক অর্থে গৃহীত হত তা বোঝা যাচ্ছে। পূর্ববৃত্তমাত্রকেই ইতিহাস বলা হত না। দেশের বা জাতির পুরাবৃত্ত থেকে ধর্মার্থকামমোক্ষ (অর্থাৎ মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ) লাভের পক্ষে উপযোগী যে শিক্ষা পাওয়া যায়, পূর্ববৃত্তান্তের সঙ্গে যখন সে শিক্ষাও সংযুক্ত হয় তখনই তা ইতিহাস পদবাচ্য হয়। অর্থাৎ প্রাচীন ঘটনাবলীর বিবৃতিমাত্রকেই ইতিবৃত্ত বা পুরাবৃত্ত বলা যেতে পারে, কিন্তু তাকে কখনই ইতিহাস বলা যায় না। প্রাচীন কালের ঘটনাবলী আমাদের জন্য যে শিক্ষার সম্পদ্ বহন করে, পুরাবৃত্ত-কথার সঙ্গে যখন সে শিক্ষার সংযোগ ঘটে তখনই তা হয়ে ওঠে ইতিহাস। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও একথার সমর্থন পাই। উক্ত গ্রন্থে প্রথমেই ইতিহাসকে পঞ্চম বেদ বলে স্বীকার করা হয়েছে—সামর্গ্‌যজুর্বেদাস্ত্রয়স্ত্রয়ী, অথর্ববেদেতিহাসবেদৌ চ বেদাঃ (১।১।৩)। অতঃপর ইতিহাস নামের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে (১।১।৫) বলা হয়েছে,—

পুরাণমিতিবৃত্তমাখ্যায়িকোদাহরণং ধর্মশাস্ত্রমর্থশাস্ত্রং চেতীতিহাসঃ অন্যত্র (৫।৫।৬) আছে—

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বোধয়েদর্থশাস্ত্রম্ ।

বোঝা যাচ্ছে ইতিবৃত্তমাত্রই ইতিহাস নয়। ইতিহাস কথার অর্থব্যাপ্তি ইতিবৃত্তের চেয়ে বেশি। ইতিহাসে ধর্মশাস্ত্র- ও অর্থশাস্ত্র-বিষয়ক শিক্ষা থাকা চাই, ইতিবৃত্তে তা থাকে না। অর্থাৎ ঐতিহ্যগত সমাজনীতি ও রাজনীতি শিক্ষাই ইতিহাসের প্রধান কথা। উদ্‌ধৃত শেষ উক্তিটি থেকেও বোঝা যায়, ইতিহাসের সাহায্যেই অর্থশাস্ত্রের অর্থাৎ রাজনীতির শিক্ষা দেওয়া কৌটিল্যের অভিপ্রেত। এই গ্রন্থে এরকম ঐতিহাসিক শিক্ষার দৃষ্টান্তও আছে। যেমন—তদ্বিরুদ্ধবৃত্তিরবশ্যেন্দ্রিয়শ্চাতুরন্তোঽপি রাজা সদ্যো বিনশ্যতি, যথা দাণ্ডক্যো নাম ভোজঃ কামাদ্ ব্রাহ্মণকন্যাম-ভিমন্যমানঃ সবন্ধুরাষ্ট্রো বিননাশ, করালশ্চ বৈদেহঃ (১।১।৬)।

মোট কথা, ইংরেজি ক্রনিক্‌ল্ ও হিস্টরির যে পার্থক্য, আমাদের ইতিবৃত্ত ও ইতিহাসেরও অনেকাংশে সেই পার্থক্য।[১] ১৯৫০ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস চর্চার নামে যে গবেষণা-আলোচনা হয়েছে তার সবই পুরোপুরি না হলেও প্রধানতঃ বাংলার ইতিবৃত্তেরই চর্চা, ইতিহাসের নয়। সে-সব প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদিতে

---

১ আধুনিক কালে বাংলায় ইতিবৃত্ত ও ইতিহাস একার্থেই ব্যবহৃত হয়, এই দুই শব্দের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় না। বর্তমান নিবন্ধেও এই দুই শব্দের পার্থক্য স্বীকৃত হয়নি। তবে বিশেষ প্রয়োজনবোধে স্থলে স্থলে উক্ত পার্থক্য স্পষ্ট করেই ব্যক্ত হয়েছে। পাঠকের পক্ষে সে পার্থক্য ধরা কঠিন হবে না। ইতিবৃত্ত, পুরাবৃত্ত, পূর্ববৃত্ত একার্থক। ইতিহাস শব্দের অর্থ ব্যাপকতর।

প্রাচীন বাংলার ঘটনাপরম্পরার পারম্পরিক সম্পর্কনির্ণয় করবার এবং তার যথাযথ বিবরণ দেবার প্রয়াসই দেখতে পাই; তার থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রনীতিগত শিক্ষালাভের চেষ্টা দেখতে পাই না। হয়তো সে শিক্ষা গ্রহণের সময়ও হয়নি তখন পর্যন্ত, কেননা ইতিবৃত্তের কাঠামো সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ইতিহাসের শিক্ষাগ্রহণ সম্ভব নয়। একথা বলা যেতে পারে যে, বিংশ শতকের বিগত অর্ধ ছিল বাংলার পুরাবৃত্তচর্চার যুগ এবং তার আগামী অর্ধ হবে ইতিহাসচর্চার যুগ। এই দুই যুগের সন্ধি-স্থলেই হচ্ছে 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থখানির স্থান। এক দিকে বিগতকালীন পুরাবৃত্তচর্চার ধারা, অপর দিকে অনাগতকালীন ইতিহাসচর্চার ধারা, এই দুই ধারার শুভসংগম ঘটেছে এই মহা-গ্রন্থে। তাই বলছিলাম বাঙালির এক যুগব্যাপী আত্মদর্শন-সাধনার সার্থক পরিণতি ঘটেছে এই গ্রন্থে, তেমনি ওই সাধনার আর-এক যুগব্যাপী মহাসম্ভাব্যতার শুভসূচনাও ঘটেছে এই গ্রন্থেই।

ইতিবৃত্ত হিসাবে 'বাঙ্গালীর ইতিহাসে' নূতন তথ্য বা নূতন গবেষণা বিশেষ কিছু নেই। নীহাররঞ্জন নিজেই বলেছেন, তিনি এই গ্রন্থে পণ্ডিতসমাজের অজ্ঞাত কোনো তথ্য বা উপাদান ব্যবহার করেননি। অল্পাধিক পরিজ্ঞাত তথ্যসমূহকেই তিনি নিজের প্রয়োজন অনুসারে নূতনভাবে বিন্যস্ত করেছেন মাত্র। এই ক্ষেত্রে পূর্বসূরীরা বহু কালের শ্রমে ও সাধনায় তথ্যসংগ্রহাদি প্রাথমিক কর্তব্যের পরে ঘটনাপারম্পর্যের ভিত্তির উপরে বাংলার

প্রাচীন ইতিবৃত্তের যে বৃহৎ কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন, নীহাররঞ্জন কার্যতঃ তাকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। এই ইতিবৃত্ত রচনার শেষরূপ দেখি রমেশচন্দ্রের সম্পাদিত বাংলার ইতিহাস প্রথম খণ্ডে। এই গ্রন্থখানি হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, রমেশচন্দ্র মজুমদার, রাধাগোবিন্দ বসাক-প্রমুখ বারো জন লেখকের সংঘবদ্ধ রচনার সমষ্টি, নীহাররঞ্জনও আছেন এই লেখকসংঘে। ১৯৪৩ সালে যদি এই গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্তের কাঠামো সমগ্রভাবে দেখা না দিত, তবে ১৯৫০ সালে নীহাররঞ্জনের পক্ষে বাঙ্গালীর ইতিহাস প্রকাশ করা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। বস্তুতঃ তিনি বহু গবেষকের বহুকালব্যাপী বহু রচনার সার সংগ্রহ করে একত্র সংহত ও বিন্যস্ত করেছেন এই গ্রন্থে। এই হিসাবে বলা যায় বাঙ্গালীর ইতিহাসখানি হচ্ছে বাংলার পুরাবৃত্তচর্চার মহাভারত অর্থাৎ মহাসংকলনগ্রন্থ বা এন্‌সাইক্লোপীডিয়া, এবং গ্রন্থকার হচ্ছেন বাংলার আধুনিক যুগের ব্যাস বা সংকলনকর্তা। আদিপর্ব নামটির দ্যোতনাও তাই।

রমেশচন্দ্রের সম্পাদিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার ইতিহাস বইখানির ভিত্তির উপরেই নীহাররঞ্জনের বাঙ্গালীর ইতিহাস প্রতিষ্ঠিত। তা হলেও এই দুই বইএ অনেক পার্থক্য আছে। একটি প্রধান পার্থক্যের কথা এখানেই বলা প্রয়োজন। প্রথমখানি একটি লেখকসংঘের সমবেত চেষ্টার ফল; বিভিন্ন অধ্যায় বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের রচিত, তাতে গ্রন্থের মূল্যবত্তা ও নির্ভরযোগ্যতা

অনেকখানি বেড়েছে সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে বিভিন্ন লেখকের দৃষ্টি, আদর্শ, ভাষা ও আলোচনাপদ্ধতির মধ্যে স্বভাবতঃই যে সমতার অভাব থাকে, তার ফলে গ্রন্থখানির ঐক্য ও সমগ্রতা কতকাংশে ব্যাহত হয়েছে। বাঙ্গালীর ইতিহাস এক হাতের রচনা; সুতরাং স্বভাবতঃই বইখানির সর্বত্র ভাব- ও ভাষা-গত ঐক্য প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। কিন্তু একই লেখকের পক্ষে বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের সকল বিভাগে সমান পারদর্শিতা লাভ এখনও সম্ভব নয়; তাই গ্রন্থের সব অধ্যায়ের মূল্যবত্তা ও নির্ভরযোগ্যতা সমস্তরে স্থাপিত হতে পারেনি, এটাও অপ্রত্যাশিত নয়।

পূর্বে বলেছি আলোচ্যমান গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্যের শেষ পুরাবৃত্ত এবং প্রথম ইতিহাস। শেষ পুরাবৃত্তকার হিসাবে নীহাররঞ্জন যে মর্যাদারই অধিকারী হন না কেন, প্রাচীন বাংলার প্রথম ঐতিহাসিক হিসাবে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। পুরাবৃত্তকারের মতো তিনি শুধু তথ্যসন্নিবেশ ও ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দান করেই নিরস্ত হননি, তিনি প্রত্যেকটি তথ্য ও ঘটনার তাৎপর্য নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন, বিভিন্ন তথ্য ও ঘটনার মধ্যে কার্যকারণসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। এখানেই ইতিবৃত্তের সঙ্গে ইতিহাসের পার্থক্য এবং এটাই 'বাঙ্গালীর ইতিহাস'এর বিশেষ গৌরব। এদিকে যে পূর্বে কারও দৃষ্টি পড়েনি তা নয়। পূর্বে দেখেছি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস'খানিকেই (১৮৭৪) বঙ্কিমচন্দ্র 'সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ' বিশেষণ দিয়ে তার সম্বন্ধে বলেছিলেন, "ইহা কেবল রাজগণের নাম ও

যুদ্ধের তালিকামাত্র নহে; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস”। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও পুনঃপুনঃ বাংলার পুরাবৃত্তের তাৎপর্য নির্ণয়ের আবশ্যকতার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তৎপরেও অনেকেই এখানে সেখানে বাংলার পুরাবৃত্তের কিছু কিছু ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন। ইদানীং কালে দীনেশচন্দ্র (বৃহৎ বঙ্গ), প্রমোদলাল পাল (**Early History of Bengal**, দ্বিতীয় খণ্ড), সুকুমার সেন (প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী), রমেশচন্দ্র (ঢাকার **History of Bengal**, প্রথম খণ্ড) -প্রমুখ অনেকেই বাংলার পুরাবৃত্তকে ইতিহাসের রূপ দিতে, অর্থাৎ জাতীয় জীবনের পক্ষে তার পুরাবৃত্তের তাৎপর্য নির্ণয় করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এই প্রয়াসকে সম্পূর্ণতা দান করেছেন নীহাররঞ্জন। এদিক্ থেকে বিচার করলে বলা যায় ‘প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাসে’ (১৮৭৪) যে নীতির অতি ক্ষীণ সূত্রপাত হয়েছিল, তার অতি বৃহৎ পরিণতি ঘটেছে ‘বাঙ্গালীর ইতিহাসে’ (১৯৫০)। বঙ্কিমচন্দ্র যে আদর্শ বাংলার ইতিহাসের জন্য এমন উদ্দীপনাময় আবেদন জানিয়েছিলেন, দীর্ঘ পাদোনশতাব্দীকাল পরে তা সার্থকতা লাভ করল। বঙ্কিমচন্দ্র আজ নেই, কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষিত বাঙালির ইতিহাস এতদিন পরে পাওয়া গেল। তিনি বলেছিলেন, “বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নতুবা বাঙ্গালীর ভরসা নাই”। এতদিন পরে তাঁর কথার প্রতিধ্বনি করে বলতে পারি,—বাংলার ইতিহাস পাওয়া গেছে, সুতরাং বাঙালির ভরসা আছে।

ত্রুটিবিচ্যুতি

প্রত্নতাত্ত্বিক তথা ইতিবৃত্তকার হিসাবে নীহাররঞ্জনের বিশেষ কিছু কৃতিত্ব নেই, একথা বললে অন্যায় হয় না। বাংলার প্রাচীন ইতিবৃত্তবিষয়ক কোনো নূতন উপকরণ তিনি আবিষ্কার বা সংগ্রহ করেননি। উক্ত ইতিবৃত্তের কোনো জটিল সমস্যারও তিনি সমাধান করেননি। দীর্ঘকাল ধরে বহু গবেষকের যত্নে আবিষ্কৃত ও ব্যাখ্যাত বহুধাবিক্ষিপ্ত তথ্যখণ্ডের যোজনায় ইতিবৃত্তের যে কঙ্কাল গড়ে উঠেছে তার গঠনকার্যেও তাঁর কোনো দান নেই। এমন কি, অধুনাজ্ঞাত সমস্ত তথ্যকেই যে তিনি বাঙালির ইতিহাস নির্মাণে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছেন তাও বলা যায় না। এ বিষয়ে এই গ্রন্থে যে ত্রুটিবিচ্যুতি আছে তা দেখানো বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্যবহির্ভূত। সে কাজের ভার বিশেষজ্ঞ-গণের উপরেই রইল। তবে ও-রকম ত্রুটিবিচ্যুতি যে আছে তার প্রমাণস্বরূপ একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দেখালেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে। আমরা পূর্বেই দেখেছি প্রতীহাররাজ ভোজদেবের গোয়ালিওর প্রশস্তির হীরানন্দ শাস্ত্রী-ধৃত পাঠের (১৯০৩-০৪) উপরে নির্ভর করে দীনেশচন্দ্র তাঁর বইএরই নাম করলেন 'বৃহৎবঙ্গ'। অথচ পরবর্তী কালে (১৯২৫-২৬) উক্ত প্রশস্তির পুনঃসম্পাদনকর্তা রমেশচন্দ্র স্পষ্ট করেই বলেছেন 'বৃহদ্‌বঙ্গান্‌' পাঠ ঠিক নয়, প্রকৃত পাঠ হচ্ছে 'বৃহদ্‌বংশান্‌'। অর্থসংগতির বিচারেও এই দ্বিতীয় পাঠই সমীচীন সন্দেহ নেই। দীনেশচন্দ্রের ন্যায় নীহাররঞ্জনও এটুকু লক্ষ্য

করেননি। তিনি তাঁর গ্রন্থের ১৫৩ পৃষ্ঠায় 'বৃহদ্‌বঙ্গান্‌' পাঠই মেনে নিয়েছেন এবং অন্যত্রও স্থলে স্থলে বৃহদ্‌বঙ্গ কথাটা ব্যবহার করেছেন।

এই প্রসঙ্গেই এই গ্রন্থের আর-একটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার ইতিহাস প্রকাশের দ্বারাও বাঙালির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের অভাবমোচন হয়নি, এই বোধেই 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এ-রকম আদর্শস্থানীয় গ্রন্থের একটি অপরিহার্য কর্তব্য তার প্রত্যেকটি উক্তি ও সিদ্ধান্তের সমর্থক প্রমাণ যথাস্থানে উল্লেখ করা। একাজ সংখ্যানুক্রমে প্রতিপৃষ্ঠার নীচে পাদটীকার আকারে বা প্রতি অধ্যায়ের শেষে (এমন কি গ্রন্থের শেষে) ধারাবাহিক টীকার আকারেও করা যায়। এটাই সর্বদেশের পণ্ডিতসমাজের স্বীকৃত রীতি। এই সর্বসম্মত রীতি 'বাঙ্গালীর ইতিহাসে' স্বেচ্ছায় লঙ্ঘিত হয়েছে। এই রীতি লঙ্ঘনের যে কারণ গ্রন্থকার দেখিয়েছেন সে সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারি না। বইটি যদি শুধু সাধারণ পাঠকসমাজের জন্যই অভিপ্রেত হত, যদি ঐতিহাসিক-সমাজে বাংলার প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বলে স্বীকৃত হবার দাবি না থাকত, যদি আদর্শের বিচারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থখানির অপূর্ণতা পূরণের প্রশ্ন না থাকত, তবে এই প্রমাণোল্লেখের অভাব সম্বন্ধে কোনো অভিযোগই উঠতে পারত না। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলেছেন, "এইটুকুই শুধু বলিতে পারি যে, কোনো

সাক্ষ্যপ্রমাণকেই আমি সজ্ঞানে বিকৃত করি নাই বা এমন কোনো উপাদান বা সাক্ষ্যপ্রমাণ ব্যবহার করি নাই যাহা অবিসংবাদিত ভাবে মিথ্যা বা অগ্রাহ্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে"। তাঁর এই উক্তি মেনে নিয়েও বলব যে, যথাস্থানে যথোচিতভাবে সাক্ষ্যপ্রমাণের উল্লেখ না থাকাতে একদিকে যেমন সত্যনির্ণয়ের অন্তরায় থাকল, অপরদিকে তেমনি পণ্ডিতসমাজ তথা বুদ্ধিমান্ পাঠকসমাজে এই গ্রন্থের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সংশয়ের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান থেকে যাবে। এটা এই মহাগ্রন্থের পক্ষে কম অগৌরবের কথা নয়। এ-রকম বৃহৎ গ্রন্থের রচয়িতার পক্ষে অজ্ঞানকৃত বহু ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে যাওয়াও অপ্রত্যাশিত নয়। সাক্ষ্যপ্রমাণের যথোচিত উল্লেখের দ্বারা সেসব ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধনের এবং ফলে সত্যনির্ণয়ের সহায়তা হয়। এই পুস্তকে গ্রন্থকার সেই সংশোধন ও সত্যনির্ণয়ের সহজ পথটি খোলা রাখেননি। তাতে শুধু যে পণ্ডিতসমাজেরই অসুবিধা হবে তা নয়, লেখকের পক্ষেও ভবিষ্যতে গ্রন্থের ত্রুটিবিচ্যুতি নিরাকরণ করে সংস্কারসাধন করা সহজসাধ্য হবে না। তা ছাড়া, এই গ্রন্থের কোনো সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে অনেকের পক্ষেই দ্বিধা হবে, কেননা ওই সিদ্ধান্তের যথার্থতা যাচাই করে নেবার কোনো সহজ উপায় নেই। ফলে অনুসন্ধিৎসুকে একাজের জন্য এই গ্রন্থ ছেড়ে ঢাকার বাংলার ইতিহাস প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থের উপরেই নির্ভর করতে হবে। এই যে নির্ভর-যোগ্যতার অভাব, এটা এ-রকম গ্রন্থের পক্ষে খুবই অপ্রশংসার

কথা। গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সর্বত্রই যে এই সংশয়ের অবকাশ রাখা হল, তার গাঢ় ছায়ায় এই গ্রন্থের উজ্জ্বলতা অনেকাংশেই পরিম্লান হয়ে থাকবে। এটা কম দুঃখ ও ক্ষতির কথা নয়। আশা করি এই গ্রন্থের নূতন সংস্করণ হতে বিলম্ব হবে না এবং সে সুযোগে গ্রন্থকার এই গুরুতর অভাব মোচনে কার্পণ্য করবেন না। এই অভাবটি দূর করা হলে নূতন শিক্ষার্থীর এবং গবেষণার্থীরও সহায়তা হবে। যথাস্থানে যথোচিত প্রমাণোল্লেখ না থাকায় বর্তমান অবস্থায় এই গ্রন্থখানি অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষার্থী গবেষকের বিশেষ কিছু কাজে লাগবে না। যারা শুধু প্রাচীন বাংলার ঐতিহাসিক পরিচয় লাভ করতে চায়, গ্রন্থোক্ত তথ্যের পরীক্ষা বা সিদ্ধান্তের বিচারে যাদের আগ্রহ নেই, একমাত্র এইরকম পাঠকের উদ্দেশ্যেই এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে, একথা মনে করতে ইচ্ছা হয় না।

একথাও বলা দরকার যে, প্রতি অধ্যায়ের শেষে যে-ভাবে প্রমাণপঞ্জীর তালিকা দেওয়া হয়েছে তাতে পূর্বগামীদের প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় না। ঋণস্বীকারের বিনয় মনস্বিতারই ভূষণ। কোনো তথ্যের মূল উৎসের উল্লেখ বা অনুল্লেখে সাধারণ কর্তব্যতারই প্রশ্ন আসে, বিনয়ের প্রশ্ন আসে না; কিন্তু যাঁরা কোনো তথ্যের প্রথম সন্ধান দেন বা তার তাৎপর্যের প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যথাস্থানে তাঁদের নাম ও রচনার উল্লেখ না থাকলে বিনয়েরই প্রশ্ন আসে। বাঙ্গালীর ইতিহাস এই

অবিনয়ের ত্রুটি থেকে মুক্ত, একথা বলতে পারলে সুখী হতাম। গ্রন্থকর্তা প্রমাণোল্লেখের যে পদ্ধতি গোড়াতেই স্বীকার করে নিয়েছেন, তাই এই মহৎ গ্রন্থখানিকে ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে। বেশি দৃষ্টান্ত দেবার দরকার নেই, কারণ গ্রন্থের সর্বত্রই তার ছাপ রয়েছে। তবু একটা নমুনা দেখাই। শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্তের 'হাজার বছরের পুরানো বাঙলা ও বাঙালী' প্রবন্ধটিকে (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫৫ বৈশাখ-আষাঢ়, পৃ ২৪৮-৬৮) স্পষ্টতঃই সংক্ষিপ্ত আকারে কাজে লাগানো হয়েছে গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে (যথা—একাদশ অধ্যায় পৃ ৫৪২-৪৯, দ্বাদশ অধ্যায় পৃ ৬৫১-৫৪)। অথচ অধ্যায়ের শেষে প্রমাণপঞ্জীর তালিকায় বা অন্যত্র উক্ত প্রবন্ধ ও তার রচয়িতার নাম নেই। সম্ভবতঃ এগুলি অনবধানতারই ফল; কিন্তু কার্যতঃ তা পূর্বগামীদের প্রতি সৌজন্য প্রকাশে অন্তরায় ঘটায়।

চিত্রসম্পদ

এই গ্রন্থে বাংলার মধ্যযুগের যে কয়খানি মানচিত্র দেওয়া হয়েছে, প্রাচীন বাংলার ভূপরিচয় লাভের পক্ষে সেগুলি খুবই সহায়ক। অতঃপর তার চিত্রসম্পদের কথা আপনিই আসে। গ্রন্থের শেষদিকে বত্রিশখানি সুনির্বাচিত ও সুমুদ্রিত চিত্র দেওয়া হয়েছে। ক্যাম্‌ব্রিজ হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি গ্রন্থের অনুসরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার ইতিহাস প্রথম খণ্ডেও অনেকগুলি (১৯০) চিত্র মুদ্রিত হয়েছে। বাঙ্গালীর ইতিহাসেও এই রীতি অনুসৃত

হয়েছে। এইরূপ চিত্রপ্রকাশের পদ্ধতি এদেশে দীর্ঘকাল যাবতই স্বীকৃত হয়ে আসছে। বহুকাল পূর্বেই দেখি কালীপ্রসন্নের 'বাঙ্গালার ইতিহাস—নবাবী আমল', দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রভৃতি গ্রন্থে চিত্রপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। রমাপ্রসাদের গৌড়রাজমালা এবং অক্ষয়কুমারের গৌড়লেখমালাতেও কিছু কিছু চিত্রসংযোগের দৃষ্টান্ত আছে। অতঃপর রাখালদাসের বাঙ্গালার ইতিহাসেই এই রীতির চরম বিকাশ ঘটে। এই গ্রন্থের শেষাংশে একত্রিশখানি সুনির্বাচিত ও সুমুদ্রিত চিত্র সন্নিবিষ্ট হয়। নীহাররঞ্জনও এই রীতি অনুসারে বত্রিশখানি চিত্র যোজনা করে গ্রন্থের মর্যাদা রক্ষা করেছেন। চিত্রগুলি সুনির্বাচিত, কিন্তু বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে রাখালদাসের চিত্রসমাবেশের গৌরব অতিক্রান্ত হয়েছে কিনা সন্দেহ। এ প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্রের বৃহৎবঙ্গ গ্রন্থের চিত্রাবলীর কথাও স্মরণীয়। আলোচ্য বিষয়ের অজস্র প্রাচুর্যে, নানা তথ্যের তাৎপর্য নির্ণয়ের প্রয়াসে, বাঙালির জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও গভীরতায় প্রবেশের আকাঙ্ক্ষায়, স্বদেশপ্রীতির আন্তরিকতায় এবং ভাষার সাহিত্যসুলভ আবেগশীলতায় বৃহৎবঙ্গকেই বাঙ্গালীর ইতিহাসের যথার্থ অগ্রগামী বলে স্বীকার করতে হয়। বৃহৎ বঙ্গের সংখ্যাতীত ত্রুটিবিচ্যুতি বাঙ্গালীর ইতিহাসে বর্জিত ও সংশোধিত হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় একটি বিষয়ে বৃহৎ বঙ্গের গৌরব অক্ষুণ্ণ রয়েছে, সে তার চিত্রসম্পদ্। চিত্রের সংখ্যা নির্বাচন মুদ্রণ ইত্যাদির কথা বলছি না। গ্রন্থের পাঠ্যবস্তুর সঙ্গে

সঙ্গেই যে প্রাসঙ্গিক চিত্রসমূহ মুদ্রিত হয়েছে, আমি বিশেষ করে তার কথাই বলছি। পাঠ্যবস্তু ও চিত্রের এ-রকম পাশাপাশি সমাবেশের দ্বারা পুরাকালের যে ছবি পাঠকের মনে অঙ্কিত হয় তার ছাপ সহজে মোছে না, বস্তুতঃ এর দ্বারাই ইতিহাস-রচনার উদ্দেশ্য সব চেয়ে বেশি সিদ্ধ হয়। বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকের কথা বাদ দিলে ইংরেজি বা বাংলা কোনো বাংলার ইতিহাসেই চিত্রবিন্যাসের এই রীতি দেখেছি বলে মনে হয় না। বাঙ্গালীর ইতিহাসের পরবর্তী সংস্করণে যদি এই রীতি স্বীকৃত হয় তবে বাঙালির মনে বাংলার পুরাচিত্র স্থায়িভাবে মুদ্রিত করে দেবার অনেকখানি সহায়তা হবে বলে আমার বিশ্বাস।

বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার সম্ভবপরতা

এবার ইতিহাস হিসাবে এই গ্রন্থখানির মূল্য কতখানি সে বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা দরকার। প্রথমেই মনে হতে পারে প্রাচীন বাংলার ইতিবৃত্তের উপকরণ এত অপ্রচুর যে, তার উপরে নির্ভর করে তথ্যতাৎপর্যময় পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা সহজ নয়, বিশেষতঃ প্রাচীন বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া তো অসম্ভব বললেই হয়। বস্তুতঃ এই মনোভাবটিই এতদিন যাবৎ দেশে প্রবল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু রাজার নাম ও যুদ্ধের তালিকাময় বাংলার ইতিহাস চাননি, বাংলার রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের 'সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ' ইতিহাসই চেয়েছিলেন। পূর্বে নানা প্রসঙ্গেই, বিশেষতঃ রাজকৃষ্ণ-

রচিত বাঙ্গালার ইতিহাসের বঙ্কিমকৃত সমালোচনার প্রসঙ্গে, আমরা তার পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু তার পরে নানা কারণেই আমাদের দেশের মনীষিমণ্ডল উক্তপ্রকার সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ 'ইতিহাস' রচনার পরিবর্তে 'ইতিবৃত্তে'র কাঠামো রচনার কাজেই ব্রতী হলেন। এটাই স্বাভাবিক ও সংগত। যেখানে ইতিবৃত্তের কাঠামোই তৈরি হয়নি, সেখানে ইতিহাসের পূর্ণরূপ দেওয়া সম্ভব নয়। এই প্রাথমিক অবস্থায় উক্ত রূপের সন্ধানে অগ্রসর হলে মতভেদ ও বিতর্কের ফলে সমস্ত সাধনাই পণ্ড হয়ে যেত। বস্তুতঃ তখনকার দিনে একমাত্র কমলাকান্তের মত স্বদেশপ্রীতির নেশায় বিভোর না হলে 'মা যা ছিলেন' তার পূর্ণরূপ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব ছিল না। তাই আমাদের দেশের পুরাতত্ত্বব্রতীরা সেদিকে না গিয়ে, ইতিবৃত্তের কাঠামো রচনাতেই আত্মনিয়োগ করলেন। দীর্ঘ সাধনার ফলে সে কাঠামো আজ মোটামুটিভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে বলা যায়। তার প্রমাণ রমেশচন্দ্রের সম্পাদিত বাংলার ইতিহাস প্রথম খণ্ড। অতঃপর ওই ইতিবৃত্তের কাঠামোর উপরে তথ্যতাৎপর্যের রেখা ও রঙের যোগে ইতিহাসের মূর্তি গড়ে তোলবার সময় এসেছে মনে করা যেতে পারে। অন্তুতঃ নীহাররঞ্জন তাই মনে করে বাংলার প্রথম ঐতিহাসিকরূপে সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন। যাঁরা বাংলার 'ইতিবৃত্ত' রচনার সাধনায় জীবন কাটিয়েছেন তাঁরা বলতে পারেন সে 'ইতিহাস' রচনা এখনও সম্ভব নয়। একথার উত্তরে বলা যায় যে, অন্য মত পোষণের অধিকার সকলেরই

আছে, নীহাররঞ্জনেরও আছে। অবশ্য তাঁর এই গ্রন্থখানি যথার্থ বাঙ্গালীর ইতিহাস হয়েছে কি না এবং কোথায় তার ত্রুটি আছে, তা বলবার অধিকারও সকলেরই আছে।

নীহাররঞ্জনের পক্ষে কি বলা যায় তা দেখা যাক। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস রচনার যে উপকরণ আজ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে তা অপ্রচুর হতে পারে, কিন্তু এত অপ্রচুর নয় যে প্রাচীন বাংলার একখানি বিরলবর্ণ ঐতিহাসিক চিত্রও আঁকা যায় না। বাংলার রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্ত রচনার উপাদানও তো অন্য দেশের তুলনায় নৈরাশ্যজনকভাবেই অপ্রচুর। তথাপি যদি রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্তের কাঠামো রচনা অসম্ভব না হয়ে থাকে, তবে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কাঠামো গড়ে তোলাই অসম্ভব বলে গণ্য হবে কেন? তা ছাড়া, একথা সুবিদিত যে বাংলার, তথা ভারতবর্ষেরও, রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্তেরই উপাদানবিরলতা সর্বত্র; সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদান তো অপ্রচুর নয়ই, বরং তার অজস্রতাই পুরাতাত্ত্বিকের মনে নৈরাশ্য সঞ্চার করে। বাংলার প্রাচীন যুগ সম্পর্কে এই অজস্রতা স্বীকার্য না হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্তের তুলনায় অন্যবিধ বিবরণের উপাদান অপ্রচুর নয় একথা বলা আশা করি অনুচিত হবে না। কেননা, তাম্রলেখ প্রভৃতি যে-সব উপকরণের সাহায্যে রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্ত রচিত হয় তাতে রাজা ও রাজন্যদের সম্বন্ধে যত তথ্য পাওয়া যায়, বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধেও তত বা ততোধিক

তথ্যই মেলে। অধিকন্তু সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাংলা প্রভৃতি সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় উপাদানের চেয়ে অন্যবিধ উপাদান যে বেশি তাতে সন্দেহ নেই। আসল কথা এই যে, আমাদের পুরাব্রতীরা রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্ত রচনার জন্য এই উপকরণবিরলতার মধ্যেও যে অসীম ধৈর্য ও যত্ন সহকারে উঞ্ছবৃত্তির আশ্রয় নিয়েছেন, বাংলার সাধারণ জীবনের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা কেউ ওই বিরলতার মধ্যেই অতখানি সযত্ন উঞ্ছপরায়ণতার প্রয়োজন বোধ করেননি। নীহাররঞ্জন তাঁর উঞ্ছপরায়ণতাকে ক্ষেত্রান্তরে (অর্থাৎ রাষ্ট্রের ক্ষেত্র থেকে সমাজের ক্ষেত্রে) প্রয়োগ করেছেন। ফলে তাঁর সংগৃহীত তথ্যসম্ভার একান্ত অকিঞ্চিৎকর হয়নি। রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্তের ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক উঞ্ছব্রতী দীর্ঘকাল ধরেই বিচরণ করছেন, ফলে সেখানে নূতন তথ্য প্রাপ্তির আশা খুবই কম। তাই তিনি এমন ক্ষেত্রে দৃষ্টি দিলেন যেখানে পূর্বগামী উঞ্ছব্রতীর ভিড় কম; তাই তাঁর সঞ্চয়নপ্রয়াস ব্যর্থ হয়নি, তাঁকে রিক্তহস্তে ফিরতে হয়নি, তাতে আমাদের ঐতিহাসিক জ্ঞানভাণ্ডার যে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই গ্রন্থ রচনার ফলে ভাবী অনুসন্ধিৎসুরা যদি তাঁদের তথ্যস্পৃহাকে এই জনবিরল ক্ষেত্রের দিকে চালনা করেন, তবে সেটাকেই অধিকতর লাভ] বলে মনে করব। কেননা, বাংলার রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্তের ন্যায় তার জাতীয় জীবনের ইতিহাসও বহু জনের দীর্ঘকালীন সাধনার দ্বারাই পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে তাতে

সন্দেহ নেই। নীহাররঞ্জন অমাদের দৃষ্টিকে সবলে সেদিকে আকর্ষণ করেছেন এটাই তাঁর মুখ্য কৃতিত্ব, একথা কখনও অস্বীকৃত হতে পারবে না।

গ্রন্থখানির স্থায়ী মূল্য

উক্ত তথ্যবিরলতার মধ্যে জাতীয় জীবনের পূর্ণ পরিচয়মূলক ইতিহাস রচনা করার অসুবিধা ও বিপদ্ অনেক। এ বিষয়ে নীহাররঞ্জন যে সচেতন ছিলেন না তা নয়। তথাপি তিনি কতদূর কৃতকার্য হয়েছেন তাই বিবেচ্য। একেবারে গোড়াতেই স্বীকার করা ভালো যে, কোনো বিষয়ে অগ্রণীর যে প্রাপ্য সে প্রাপ্যের উপরে তাঁর অধিকার তাঁকে দিতেই হবে। কিন্তু অগ্রনায়কের সিদ্ধান্তসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শেষপর্যন্ত সমগ্রভাবে টেঁকে না। বাঙ্গালীর ইতিহাসেরও যদি সেই পরিণতি ঘটে তবে তা এই গ্রন্থের পক্ষে অগৌরবের বিষয় হবে না। বরং স্টুআর্টের বাংলার ইতিহাস বা এলফিনস্টোনের ভারতবর্ষের ইতিহাসের ন্যায় এই গ্রন্থখানিও যদি বহু দীর্ঘকাল একমাত্র প্রামাণিক ইতিহাসের আসনে অধিষ্ঠিত থাকে তাহলেই তাতে বাঙালির অনুসন্ধিৎসাবৃত্তির দুর্বলতা সূচিত হবে এবং তাতে গ্রন্থখানিরও মর্যাদাবৃদ্ধি ঘটবে না। কেননা, তাতে প্রমাণিত হবে বাঙালিকে তার অতীত ইতিহাসকে পূর্ণতর রূপে গড়ে তোলবার দিকে প্রেরণা দেবার শক্তি এই গ্রন্থের নেই। এ বিষয়েও নীহাররঞ্জন সম্পূর্ণ সচেতন। তাই তিনি অকুণ্ঠচিত্তেই

বলতে পেরেছেন, "আমার কোনো কথাই শেষ কথা নয়।...এই কাঠামো রচনার প্রয়াস সত্যে পৌঁছিবার নিম্নতম স্তর; এই স্তর যদি ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিককে সত্যে পৌঁছিতে কিছুমাত্র সহায়তা করে তবেই আমার দেশের এবং আমার জাতির এই ইতিহাস রচনা সার্থক" (পৃ ২৫)। আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তেই এই সবিনয় অথচ সত্যনিষ্ঠ উক্তির প্রতিধ্বনি করে বলতে পারি, তাঁর এই ইতিহাসরচনা সত্যই সার্থক। কেননা একথা দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গেই বলতে পারি যে, অচিরেই এই গ্রন্থের রচিত ভিত্তির উপরে বাংলার ইতিহাসসৌধকে নূতন করে গড়ে তোলবার জন্যে বাঙালি ঐতিহাসিকের অভাব হবে না। কারণ পাঠকের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করবার, জ্ঞানব্রতীর জিজ্ঞাসাবৃত্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করবার, গবেষকের অনুসন্ধিৎসাকে প্রেরণা জোগাবার এবং প্রতিপক্ষকে স্বমতখণ্ডনের আহ্বান জানাবার শক্তি এই গ্রন্থের সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত আছে। এক কথায় বাঙালির ঐতিহাসিক চেতনাকে নানাভাবে উসকিয়ে তোলবার হেতু নিহিত আছে এই গ্রন্থের আদ্যন্তে। ভবিষ্যতে কেউ এই গ্রন্থকে উপেক্ষা করে বাংলার ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হতে পারবেন না; তাঁদের সকলকেই প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ এই গ্রন্থের আদর্শ-তথা সিদ্ধান্ত-সমূহকে সমর্থন বা খণ্ডন করে অগ্রসর হতে হবে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এই গ্রন্থের ভাবী সপক্ষীয়দের সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু প্রতিপক্ষীয়রা বাংলার ইতিহাস-

সাহিত্যের যে উপকার করবেন, তাই হবে আমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ লাভ। যেমন মিত্ররূপের চেয়ে শত্রুরূপেই ভগবানের দর্শনলাভ হয় শীঘ্রতর, তেমনি বিশ্বাসের চেয়ে সংশয়ের দ্বারাই সত্যপ্রাপ্তিও হয় অপেক্ষাকৃত সহজ। ভাষান্তরে বলতে পারি—'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর' একথা ঠিক কিনা জানি না, কিন্তু 'তর্কেই মিলয়ে সত্য বিশ্বাসে বহু দূর' একথা যে ঠিক তাতে সন্দেহমাত্র নেই। যাঁরা এই গ্রন্থের আদর্শে আস্থা স্থাপন করে তার সিদ্ধান্তগুলিকে সহজেই মেনে নেবেন তাঁরা সহজে বাংলার ইতিহাসের সত্যরূপের সাক্ষাৎ পাবেন না; তার দ্বারা গ্রন্থ তথা গ্রন্থকারের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা প্রকাশ পাবে না, বাংলাদেশ তথা তার ইতিহাসের প্রতি তো নয়ই। পক্ষান্তরে যাঁরা সংশয় বা অ-বিশ্বাসের সিংহদ্বারপথে অগ্রসর হবেন তাঁরা অচিরেই বাংলার সত্য ইতিহাসমূর্তির দর্শন পাবেন। সুতরাং ভাবী প্রতিপক্ষীয়রাই এই গ্রন্থের যথার্থ মূল্য নির্ণয়ের তথা বাংলার সত্য ইতিহাসরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রধান সহায়ক হবেন। যত সত্বর তাঁদের প্রকাশ্য আবির্ভাব ঘটে ততই মঙ্গল। অতএব একথাও বিনা দ্বিধাতেই বলা যায় যে, বাংলার ভাবি ইতিহাসসাহিত্য পরোক্ষভাবে হলেও এই গ্রন্থের দ্বারা গুরুতররূপেই প্রভাবিত হবে। যাহক, এই সংশয়পরায়ণ প্রতিপক্ষীয়দের সত্যনিষ্ঠ গবেষণার ফলে হয়তো এই গ্রন্থস্বীকৃত মূল আদর্শ তথা তার সিদ্ধান্তসমূহ অনেকাংশেই অগ্রহণীয় বলে গণ্য হয়ে বাংলার ইতিহাসের

সত্যরূপের কাছে স্থান ছেড়ে দেবে। আশা করি সেই সত্যরূপের সন্ধান পেতে বহু বিলম্ব হবে না। কারণ জিজ্ঞাসুর হৃদয়কে অধিকার করবার, নূতন নূতন চিন্তাকে উদ্‌বুদ্ধ করবার, নূতন নূতন রহস্যসন্ধানে প্রেরণা দেবার, তথা প্রতিপক্ষকে উত্থত করে তোলবার সুর এই গ্রন্থের সর্বত্র ধ্বনিত। তার ফলে যত শীঘ্র বাঙালির ইতিহাস নূতন করে লিখিত হবে, ততই গ্রন্থের গৌরব ও গ্রন্থকারের কৃতিত্ব বাড়বে। আশা করি সেই অত্থাপিঅলব্ধ সত্যরূপের সন্ধানে নীহাররঞ্জন নিজেও সপক্ষ বা প্রতিপক্ষ কারও পেছনে থাকবেন না, এবং তাঁর গ্রন্থের সংস্করণের পর সংস্করণে সেই কাম্য সত্যের দিকে অনেকখানি করে অগ্রসর হবেন। বাঙালির সত্থোজাগ্রত ঐতিহাসিক চেতনাকে আমি বিশ্বাস করি—আর এই চেতনাকে উদ্‌বুদ্ধ ও সক্রিয় করে তোলবার ব্যাপারে বাঙ্গালীর ইতিহাসের দান অন্য কোনো গ্রন্থের চেয়ে কম নয়,—সুতরাং এটাও আশা করি যে, এই নব-সচেতন বাঙালির মন গ্রন্থকারকে পুনঃপুনঃ বাঙ্গালীর ইতিহাসের নূতন নূতন সংস্করণ প্রকাশের সুযোগ দেবে।

যথার্থ ইতিহাস রচনায় রাগদ্বেষগত অন্তরায়

তথ্যতাৎপর্যময় ইতিহাস রচনার, বিশেষতঃ সে ইতিহাস যদি হয় দূরবর্তী কালের, আর-একটি বিপদের কথাও এখানে বলা প্রয়োজন। পূর্বে দেখেছি ধর্মার্থকামমোক্ষ—অর্থাৎ মানুষের

সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-বিষয়ক উপদেশসমন্বিত পুরাবৃত্তেরই নাম ইতিহাস। কিন্তু এই উপদেশ আহরণ সহজসাধ্য নয়। যুগধর্ম বা ব্যক্তিধর্মের প্রভাবে ইতিহাসের তথ্যতাৎপর্যের আলোক সরলরেখায় দেখা না দিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই তির্যক্ রেখায় প্রকাশিত হতে পারে। এ আশঙ্কা একেবারেই অমূলক নয়। বিশেষতঃ আজকালকার প্রবল কালধর্মাভিঘাতের দিনে ঐতিহাসিকের পক্ষে অবিচলিত তুলাদণ্ডের ন্যায় বিচারবুদ্ধির সমতা বা স্থিরতা রক্ষা করা খুবই কঠিন। ঐতিহাসিকের আদর্শ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের একমাত্র ঐতিহাসিক কহ্লণ দ্বাদশ শতকে যে উক্তি করে গিয়েছেন তা সর্বকালের পক্ষেই সত্য, এবং আধুনিক মত-সংঘর্ষ ও কালচাঞ্চল্যের দিনে আরও বেশি করেই অনুসরণীয়। তিনি বলেছেন—

শ্লাঘ্যঃ স এব গুণবান্ রাগদ্বেষবহিষ্কৃতা।
ভূতার্থকথনে যস্য স্থেয়স্যেব সরস্বতী॥

—রাজতরঙ্গিণী, ১।৭

অর্থাৎ সেই গুণবান্‌ই শ্লাঘ্য ভূতার্থকথনে যাঁর বাণী (সরস্বতী) স্থেয় অর্থাৎ বিচারকেরই মতো রাগদ্বেষবর্জিত হয়। এই বিচারকোচিত নিরপেক্ষতার আদর্শ সর্বযুগের ঐতিহাসিকেরই স্বীকার্য, অথচ প্রতিযুগেই এই আদর্শপালনের বিশেষ বিশেষ অন্তরায় থাকে। 'ভূতবৃত্ত'-কথনে এই আদর্শের অনুসরণ অপেক্ষাকৃত সহজ হলেও 'ভূতার্থ'-কথনে, অর্থাৎ পুরাবৃত্তের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় এই আদর্শ রক্ষা করা খুবই কঠিন। কহ্লণ-

কথিত এই আদর্শের বিষয় বোধ করি সর্বপ্রথমে স্মরণ করেছিলেন প্রবীণ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (গৌড়রাজমালা, উপক্রমণিকা, পৃ ৩)।

সুখের বিষয় নীহাররঞ্জনও এই আদর্শকে সম্মুখে রেখেই বাঙালির ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। তখনকার দিনে যে মনোবৃত্তি নিরপেক্ষ ভূতার্থকথনের অন্তরায় ঘটাত আজ তার পরিবর্তন ঘটেছে; কিন্তু অধুনাতন মনোবৃত্তি যে সর্বতোভাবেই নিরপেক্ষতার অনুকূল হয়ে উঠেছে একথাও বলা যায় না। পূর্বে বলেছি বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার পুরাবৃত্তচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন এবং অপরকে প্রেরণা দিয়েছিলেন বাংলার কলঙ্কমোচনের তথা তার অতীত গৌরবপ্রতিষ্ঠার তীব্র আবেগে, এবং তার পিছনে ছিল অতীতের সম্বল নিয়ে ভাবী মহিমার দিকে বাঙালির অগ্রগতিতে শক্তি সঞ্চারের আকাঙ্ক্ষা। বলা বাহুল্য তাঁর এই আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার মহত্ত্ব অপরিসীম এবং তারই ফলে বাঙালি অপ্রত্যাশিত দ্রুততার সঙ্গে এক গ্লানিময় যুগের সীমা পেরিয়ে নূতন এক গৌরবময় যুগে উপনীত হতে পেরেছিল। তথাপি একথা স্বীকার করতেই হবে যে, স্বদেশপ্রীতির এই দুর্নিবার আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা বাংলার ভূতস্বরূপ, অর্থাৎ 'মা যা ছিলেন' তার সত্যরূপ, দর্শনের অনুকূল নয়। দেশানুরাগের আবেশমাখা চোখে যা দেখা গিয়েছিল তা অতীত বাংলার স্বপ্নময় রূপ বটে, কিন্তু সত্যময় রূপ নয়। অতীত বাংলার এই স্বপ্নদর্শনের খেয়াল স্বদেশী-আন্দোলনের সময় পর্যন্ত অব্যাহত গতিতেই চলেছিল। কিন্তু বাংলার এই স্বপ্নলব্ধ

ইতিহাস স্বভাবতঃই কিছুকালের মধ্যেই দেশের তৃপ্তিবিধানে অসমর্থ হল। স্বপ্ন যত মনোরমই হক না কেন, তা কখনও চিরন্তন হতে পারে না। জাতীয় নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরি' স্বর্গলোকের ইতিহাস রচনার যুগও অবসিত হল। কিন্তু স্বপ্ন রচনার খেয়াল শেষ হবার পূর্বেই অন্য এক নূতন খেয়াল এসে আশ্রয় করল অনেককেই। এই মনোভাবের প্রতিবাদে অক্ষয়কুমার যা বলেছিলেন (১৯১২) তা উদ্‌ধৃত করলেই এই নূতন খেয়ালের স্বরূপ বোঝা যাবে। তিনি বলেছিলেন, "ন্যায়নিষ্ঠ বিচারপতির ন্যায় নিয়ত সত্যোদ্‌ঘাটনের চেষ্টাই যে ইতিহাসলেখকের প্রধান চেষ্টা, তাহা ভাল করিয়া আমাদের হৃদয়ংগম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।...এখনও আমাদিগের ব্যক্তিগত জাতিগত বা সম্প্রদায়গত অনুরাগ-বিরাগ আমাদিগকে পূর্ব হইতেই অনেক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের অনুকূল বা প্রতিকূল করিয়া রাখিয়াছে। পালবংশের এবং সেনবংশের নরপালগণের শাসনসময়ে দেশের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল তাহা যেন তুচ্ছ কথা, তাঁহাদিগের জাতি কি ছিল তাহাই এখনও আমাদিগের নিকট প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া রহিয়াছে" (গৌড়রাজমালা, উপক্রমণিকা, পৃ ৩-৪)। রমাপ্রসাদ চন্দ-প্রণীত গৌড়রাজমালার সময় (১৯১২) থেকে এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে এবং তথ্য- ও যুক্তি-নিষ্ঠ ইতিহাসরচনার রীতি দেখা দেয়।

স্বদেশপ্রীতির আতিশয্য তথা জাতি- কুল- ও সম্প্রদায়-গত অনুরাগ-বিরাগের প্রভাব আজ আর নেই বললেও চলে। কিন্তু

আধুনিক কালে একান্তভাবে তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার প্রতিকূল এক নূতন মনোভাবের আবির্ভাব হয়েছে। সাম্যবাদ, সমাজবাদ প্রভৃতি রাজনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশের ইতিহাসকে পুনর্গঠন করবার প্রয়াস কিছুকাল যাবৎ দেখা দিয়েছে। বিশেষ মতবাদের প্রতি আগ্রহাতিশয্যের ফলে ঐতিহাসিক সত্যে বিকৃতি ঘটে না, এমন কথা বলা যায় না। বিশেষ তত্ত্বের দৃষ্টিতে দেখলে দেশের অতীত প্রকৃতি যে স্বরূপে প্রতিভাত না হয়ে উক্ত তত্ত্বের কাঠামোতে খাপ খাওয়াবার চেষ্টায় কিছু-না-কিছু বিকৃত হয় তাতে সন্দেহ নেই। ওসব তত্ত্বের দৃষ্টির কোনো মূল্যই নেই, তাতে সত্যদৃষ্টির কোনো সহায়তাই হয় না, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কার্ল মার্ক্‌স্ যে ইতিহাসের সত্যরূপ উদ্‌ঘাটনে অনেকখানি সহায়তা করেছেন একথা আজ সুবিদিত। কিন্তু মার্ক্‌সের দৃষ্টিই ইতিহাসের সত্য দর্শনের একমাত্র উপায়, একথা মনে করলেও সত্যকে সংকীর্ণ করা হবে। পূর্বে বলেছি সংশয়ই সত্যের রাজ্যে প্রবেশের সিংহদ্বার। এক্ষেত্রেও তাই। যিনি প্রতিক্ষণেই দেশ জাতি সম্প্রদায় কুল ও বিশেষ তত্ত্বানুরাগের মোহমুক্ত হয়ে একমাত্র তথ্য- ও ন্যায়-নিষ্ঠাকে আশ্রয় করে ভূতার্থকথনে প্রবৃত্ত হন তিনিই শ্লাঘ্য, তিনিই যথার্থ ঐতিহাসিকের মর্যাদালাভের অধিকারী। কিন্তু সর্বপ্রকার রাগবিরাগের ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠান বোধ করি কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত শিক্ষা, পরিবেশ ও কালধর্মের প্রভাব প্রত্যেক মানুষকেই প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করছে। যেমন বাস্তব জগতে

প্রত্যেক বস্তুই বিশ্বজগতের অন্যান্য পদার্থের আকর্ষণের অধীন, তেমনি মনোজগতেও আমাদের প্রত্যেকরই ভাবনাসমূহ অপরের ভাবনার প্রভাবাধীন। এই পারিপার্শ্বিক ভাবনারাশির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকা বোধ করি কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। জড়জগতে দেখি কোনো পদার্থ হয় অন্য কোনো বস্তুর বিশেষ প্রভাবে আকৃষ্ট হয়ে তার প্রতি ধাবমান ও তাতে আসক্ত হয়ে থাকে, না-হয় একাধিক বস্তুর আকর্ষণের মিলিত প্রভাবের ফলে কোনো নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হয়। মনোজগতেরও এই নিয়ম। আমাদের প্রত্যেকটি ভাবনাই পারিপার্শ্বিক ভাবনার প্রভাবে হয় তৎপ্রতি ধাবমান ও আসক্ত হয়, না-হয় বিভিন্ন চিন্তার মিলিত প্রভাবে কোনো স্বতন্ত্র পথে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই স্বতন্ত্র পথ স্বীকারেরই নামান্তর নিরপেক্ষতা। এই নিরপেক্ষতাও আবার সব সময় সমভাবে অব্যাহত থাকে না, কখনও কখনও বাহ্য আকর্ষণের প্রভাবে নিরপেক্ষতার নির্দিষ্ট পথরেখা থেকে বিচ্যুতিও ঘটে থাকে। সুখের বিষয় নীহাররঞ্জন দেশানুরাগ প্রভৃতি সর্বপ্রকার মোহাকর্ষণের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে নিরপেক্ষতার কক্ষপথই বেছে নিয়েছেন এবং নেমিবৃত্তি অবলম্বন করে রেখামাত্রও বিচলিত না হয়ে সে পথের অনুসরণে নিয়ত প্রয়াসী হয়েছেন। একথা স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর এই নিরপেক্ষতার প্রয়াস মোটের উপর ব্যর্থ হয়নি। তবে গ্রহান্তরের আকর্ষণে এই নিরপেক্ষতার কক্ষপথ থেকে কোথাও কিছুমাত্র

বিচলন ঘটেনি একথা অবশ্যই বলা যায় না। সর্বপ্রকার প্রভাবমুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ অবিচলিতভাবে একমাত্র সত্যের অনুসরণ একপ্রকার অসাধ্য, একথা পূর্বেই বলেছি। কাজেই নীহাররঞ্জনের ন্যায়- ও সত্য-নিষ্ঠতা যদি কোথাও কোথাও নির্দিষ্ট পথরেখাকে অতিক্রম করে থাকে তবে বিস্মিত হবার কারণ নেই। যাঁরা বাঙ্গালীর ইতিহাসের বিস্তৃত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হবেন, তাঁরাই এইসব বিচ্যুতির পূর্ণ পরিচয় দেবেন। তবে এটাও মনে রাখা দরকার যে, বস্তুজগতের ন্যায় মনোজগতেও আপেক্ষিকতার বিশ্বনীতি স্বীকার্য। এক জনের কাছে যা নিরপেক্ষতা, আর-এক জনের কাছে তাই পক্ষপাত বলে প্রতিভাত হতে পারে। এটুকু মেনে নিয়েই অগ্রসর হতে হবে, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। যাহক, একটা দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা স্পষ্ট হবে।

গ্রন্থের আরম্ভেই নীহাররঞ্জন এই নীতি স্বীকার করে নিয়েছেন যে,—'রাজবৃত্ত' অর্থাৎ রাজকীয় ইতিবৃত্তই কোনো দেশের সমগ্র ইতিহাস বলে গণ্য হতে পারে না, লোকবৃত্তের পরিচয় দিলে তবেই ইতিহাস সম্পূর্ণতা পায়। একথা অবশ্য-স্বীকার্য এবং অন্ততঃ বঙ্কিমচন্দ্রের আমল থেকেই আমাদের দেশেও এই নীতি স্বীকৃত হয়ে আসছে। নীহাররঞ্জন তাঁর গ্রন্থে পনেরো অধ্যায়ের মধ্যে একটিমাত্র অধ্যায়ে (দশম, ৯৭ পৃষ্ঠা) বাংলাদেশের সহস্রাধিক বৎসরের রাজবৃত্ত সমাপ্ত করেছেন এবং গ্রন্থের বাকি সবটুকুই (৭৬৯ পৃষ্ঠা) লোকবৃত্ত অর্থাৎ

দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় দানে নিয়োজিত করেছেন। ঢাকার হিস্টরি অব বেঙ্গল প্রথম খণ্ডে দেখা যায়, আটটি অধ্যায়ই (তৃতীয়-দশম) লেগেছে রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্ত বর্ণনায় (২৪৯ পৃষ্ঠা), আর বাকি নয় অধ্যায়ে (৪৪০ পৃষ্ঠা) দেশের সাধারণ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাস রচনায় পূর্বসূরীদের অনুসৃত নীতির সঙ্গে নীহাররঞ্জনের অনুসৃত নীতির পার্থক্য এর থেকেই অনেকটা বোঝা যাবে। পূর্বসূরীরা রাজবৃত্ত ও লোকবৃত্তের আলোচনায় যে অনুপাত রক্ষা করা সমীচীন মনে করেন, নীহাররঞ্জন তাতে ব্যত্যয় ঘটাবার পক্ষপাতী। তার মতে রাজবৃত্তকে বহুল পরিমাণে সংকুচিত করে লোকবৃত্তকে তদনুপাতে না বাড়ালে যথার্থ বাঙালির ইতিহাস হতে পারে না। শুধু রচনার পরিমাণ সম্পর্কে নয়, রাজবৃত্ত এবং লোকবৃত্তের পারস্পরিক গুরুত্ব সম্পর্কেও ওই অনুপাত রাখা চাই। পূর্বসূরীদের প্রতি শ্রদ্ধার কিছুমাত্র হানি না ঘটিয়েও বলা যায়, রাজবৃত্ত ও লোকবৃত্তের গুরুত্বগত অনুপাতে কিছু পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাবার সময় এসেছে। বস্তুতঃ বহু সাধনায় তাঁরা রাজবৃত্তের কাঠামো তৈরি করে দিয়েছেন বলেই আজ বহু সমস্যা ও তার সমাধানের, তথা তর্কবিতর্কের, পরিমাণকে সংক্ষিপ্ত করে লোকবৃত্তকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয়েছে। নীহাররঞ্জন উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সেই সুযোগকেই কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই, তিনি উক্ত অনুপাতে পরিবর্তন ঘটাতে গিয়ে কোথাও কোনো আতিশয্য করেছেন কিনা,

প্রতিক্রিয়ার বেগে বিপরীত দিকের ঝোঁক কোথাও কিছু বেশি হয়ে গেছে কিনা। বলা বাহুল্য আপেক্ষিকতার নীতি অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টি-স্থাপনের বিভিন্নতার ফলে এ প্রশ্নের উত্তরেও পার্থক্য ঘটবে। একথা স্বীকার করে নিয়েই বলতে পারি, আমার দৃষ্টিতে মনে হয়েছে নীহাররঞ্জন যেন বিপরীত দিকে একটু বেশি ঝুঁকে পড়েছেন। আমার মনে হয় লোক-বৃত্তের গুরুত্ব বাড়াতে গিয়ে তিনি একটু অতিরিক্ত পরিমাণেই রাজবৃত্তের গুরুত্বহানি ঘটিয়েছেন। প্রথম প্রতিক্রিয়ায় এ-রকমটা হওয়াই স্বাভাবিক এবং লোকের চিত্তকে এক দিক্ থেকে অন্য দিকে ফেরাতে হয়তো একটু অতিরিক্ত জোরেই টান দিতে হয়, যেমন বঙ্কিমচন্দ্রকে করতে হয়েছিল দেশের লোকের মনকে দেশের দিকে ফেরাবার অভিপ্রায়ে।

বাংলার ইতিহাসে লোকসংস্কৃতির স্থান

দেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসে রাজবৃত্তের চেয়ে লোকবৃত্তের প্রাধান্য থাকা দরকার একথা স্বীকার করি। কিন্তু রাজবৃত্তকে উপেক্ষা করা যায় না দুই কারণে। প্রথমতঃ, রাজবৃত্ত হচ্ছে ইতিহাসের কঙ্কাল, আর লোকবৃত্ত তার রক্তমাংস। সে কঙ্কাল দৃঢ় ও সুগঠিত না হলে শুধু রক্তমাংসের দ্বারা ইতিহাসের আকৃতি ও রূপ যথোচিত ভাবে গড়ে উঠতে পারে না। এমন কি, দেহমনের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলাই যে শিল্পবিদ্যার লক্ষ্য, তাও যথোচিত অস্থি-সংস্থান-জ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। রাজবৃত্ত ইতিহাসের প্রাণ নয়

সত্য, কিন্তু রাজবৃত্তের কঙ্কাল ইতিহাসদেহকে ধারণ না করলে তার প্রাণক্রিয়াও ঠিকমতো চলতে পারে না। তাই তো দেখি, যে কালের বাংলার ইতিহাসের রাজবৃত্ত নেই সে কালের লোকবৃত্তও অজ্ঞাত, যেমন গুপ্তপূর্ব যুগ; যে কালের রাজকীয় ইতিহাস অস্পষ্ট সে কালের সামাজিক জীবনের চিত্রও অস্পষ্ট, যেমন গুপ্তোত্তর কাল। পক্ষান্তরে রাজকীয় ইতিবৃত্ত যেখানেই সুপ্রকাশিত সেখানেই সাধারণ জীবনের বিষয়ও অপেক্ষাকৃত সুজ্ঞাত, যেমন পাল- ও সেন-যুগ। বস্তুতঃ অনেকাংশে রাজবৃত্তের আলোকেই লোকবৃত্ত রচনা করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাজবৃত্ত বস্তুতঃ লোকবৃত্ত থেকে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র বস্তু নয়। ভারতবর্ষের সমাজ যে রাজকেন্দ্রিক, রাজাই যে সমাজকে ধারণ করতেন, এই ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। সুতরাং আমাদের রাজবিধৃত সমাজের ইতিবৃত্তকে কখনও রাজবৃত্ত থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না। আমাদের মনটাই যে চিরকাল রাজ-কেন্দ্রিক, সুতরাং আমাদের মনোজগতেও রাজার প্রভাব অপরিসীম। শুধু অর্থশাস্ত্র-ধর্মশাস্ত্র নয়, রামায়ণ-মহাভারত থেকে রঘুবংশাদি কাব্যেও ওই রাজগত সমাজমনেরই পরিচয় পাই। এ-রকমটা না হলেই হয়তো ভালো হত, কিন্তু যা হয়ে গিয়েছে, ইতিহাস তো তা অগ্রাহ্য করতে পারে না।

রাজা ও রাজবংশের দ্বারা আমাদের সমাজজীবন ও সংস্কৃতি কি ভাবে প্রভাবিত হয় তার দৃষ্টান্ত তো বাংলার ইতিহাসেই পুনঃপুনঃ পাওয়া গিয়েছে। একেবারে হাল আমলে পূর্ব ও

পশ্চিম বঙ্গ দুই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতি যে গুরুতর পরিবর্তনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে তা তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। ১৯০৫ সালের বঙ্গবিভাগের ফলও চিন্তনীয়। ওই বিভাগ যদি পরে প্রত্যাহৃত না হত তাহলেও তার ফল যে সুদূরপ্রসারী হত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শুধু আধুনিক কালে নয়, প্রাচীন কালেও যে রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের প্রভাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে যেত তার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণে তাঁর বৃদ্ধপ্রপিতামহ নারসিংহ ওঝার সম্বন্ধে প্রথমেই বলা হয়েছে,—

> পূর্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা,
> তাহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা।
> বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির,
> বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর ॥
>
> —বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৭ম সং, পৃ ১২৫-২৬

সুকুমার সেন-কৃত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসেও (দ্বিতীয় সং, পৃ ৮৬) এই পংক্তিগুলি আছে, শুধু 'হৈল' স্থানে 'পড়িল' পাঠ আছে। দীনেশ বাবু মনে করেন,—আদত পাঠ ছিল 'যে দনুজ মহারাজা', ভ্রমক্রমে 'যে দনুজ' পাঠ 'বেদানুজ' পাঠে পরিণত হয়েছে। রামগতি ন্যায়রত্নের বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাবে (তৃতীয় সং, ১৩১৭) আছে 'শ্রীদনুজ' (পৃ ৬৩)। যাহক, এই বেদানুজ বা দনুজ আর কুলপঞ্জীর দনুজমাধব, আদাবাড়ি তাম্রলেখের অরিরাজ-দনুজমাধব দশরথদেব ও

জিআউদ্‌দিন বরনি-কথিত সোনার গাঁওএর রাজা দনুজ রায় (১২৮৩) সম্ভবতঃ অভিন্ন। তা হক বা না হক, এই বেদানুজ বা দনুজ রাজার আমলে পূর্ব বাংলায় (বঙ্গদেশে) যে 'প্রমাদ' অর্থাৎ রাষ্ট্রবিপ্লব (হয়তো তুর্কি বিজেতা-কর্তৃক রাজ্যাধিকার) ঘটেছিল তার ফলে জনসাধারণের ('সকলে'র) জীবনযাত্রাতেও বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তখন শুধু যে নারসিংহ ওঝাই বঙ্গদেশ ছেড়ে গঙ্গাতীরে (পশ্চিম বাংলায়) আসতে বাধ্য হয়েছিলেন তা নয়, আরও অনেককেই যে বাড়িঘর ছেড়ে (বর্তমান কালের পূর্বপাকিস্থানবাসী বহু হিন্দুর মত) পশ্চিমবঙ্গে এসে বাসস্থাপন করতে হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ সমাজজীবনের উপর রাষ্ট্রের প্রভাব সামান্য নয়, তা 'উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে' ইত্যাদি বচন থেকে অনায়াসেই বোঝা যায়। 'প্রমাদ' বা 'রাষ্ট্রবিপ্লবে'র আর-এক রূপ হচ্ছে 'মাৎস্যন্যায়'। পালপূর্ব যুগে এই মাৎস্যন্যায়ের ফলে বাংলার সমাজজীবন কি ভাবে বিপর্যয়গ্রস্ত হয়েছিল তা কারও অবিদিত নেই। আবার দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে যে বিপ্লব ঘটেছিল তাতেও জাতীয় জীবনে কম আলোড়ন দেখা দেয় নি। শুধু বিপ্লব-কালে নয়, শান্তির সময়েও সমাজ ও সংস্কৃতির উপরে রাজা ও রাষ্ট্রের প্রভাব কম ছিল না। বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালীন কৌলীন্যপ্রথা ও সংস্কৃতসাহিত্যের প্রসার প্রভৃতি বিষয় স্মরণ করলেই এ কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। নীহার-রঞ্জন এসব বিষয়কে অগ্রাহ্য করেছেন বা তাকে যথোচিত

গুরুত্বদানে বিরত আছেন তা নয়; তাঁর গ্রন্থে এসব বিষয় বিশদভাবেই আলোচিত হয়েছে। তথাপি নানা প্রসঙ্গেই তিনি রাজবৃত্তের গুরুত্বলাঘবের পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। আমার মনে হয় সে-সব উক্তিতে যথাযথ অনুপাত রক্ষিত হয়নি। পক্ষান্তরে লোকবৃত্তসম্পর্কেও তাঁর অভিমত আধুনিক মার্ক্সীয় মতবাদের আকর্ষণে যথার্থ নিরপেক্ষতার কক্ষপথ থেকে একটু সরে গিয়েছে বলেই আমার বোধ হয়েছে। বলা বাহুল্য, আরও অনেকেই যদি অনুরূপ মত পোষণ করেন তাহলে তাঁদের দোষ দেওয়া যাবে না। আবার একথাও অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এসব ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের মতামতেরও একটা মূল্য আছে। এই বিভিন্ন অভিমতের পারস্পরিক বিনিময়েই কালক্রমে একটা সত্য-রূপের প্রকাশ ঘটবে, এটুকুই আমার বক্তব্য।

একথাও বলা প্রয়োজন যে, নীহাররঞ্জনই যে বাংলার ইতিহাসে লোকবৃত্তকে সর্বপ্রথম গুরুত্ব দান করলেন তা নয়। তাঁর পূর্বেও কেউ কেউ লোকবৃত্তের গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছেন। বোধ করি বাংলার লোকসংস্কৃতির দিকে প্রথম দৃষ্টি দেন রবীন্দ্রনাথ, এবং তারপরে এক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে প্রবেশ করেন বিনয়কুমার সরকার। জনসাধারণের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির কথাই যে বাংলার ইতিবৃত্তের আসল কথা, বিনয়কুমারের বহু গ্রন্থেই (যেমন **Folk-Element in Hindu Culture** ১৯১৭, **Positive Background of Hindu Sociology** ১৯১৪, দ্বিতীয় সং ১৯৩৭) তা অত্যন্ত জোরের

সঙ্গে ঘোষিত হয়েছে। 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডেও[১] (১৯৪২) তার প্রচুর নিদর্শন আছে (যেমন—৩৬৭-৭২ এবং ৫৬৮-৮৬ পৃষ্ঠায়)। 'বাঙলামি' বা বঙ্গসংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি উক্তি উদ্‌ধৃত করলেই এ বিষয়ে তাঁর অভিমতের জোর বোঝা যাবে।—

লৌকিক বা লোকায়ত বঙ্গসংস্কৃতির বনিয়াদ বিপুল ও সুবিস্তৃত এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। লোকায়ত অংশ বাদ দিলে বঙ্গসংস্কৃতির প্রায় সব কিছুই বাদ পড়ে। হাজার হাজার বছর ধরিয়া বাঙালীদের আসল ধর্ম বাঙালীধর্ম, হিন্দুধর্ম নয়। আর নেহাত যদি হিন্দু বলিতেই হয় তবে বলা উচিত যে, উহা বঙ্গহিন্দু ধর্ম। লোকায়তের জয়জয়কার চলিতেছে বাঙালী সমাজে। বাঙালীর হিন্দুধর্মে লৌকিক-লোকায়তের, বাস্তবের আর মানুষের ও সংসারের স্থান খুব বেশি। ইহা তথাকথিত আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর, এইরূপ বলা নেহাত গা-জুরি মাত্র। বাঙালী মানবিকতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইল বঙ্গহিন্দু ধর্ম। সংস্কৃতের ছোঁআচটুকু বাদ দিলে বঙ্গীয় হিন্দুধর্মে আর্যামির টিকি পর্যন্ত দেখা যাইবে কিনা সন্দেহ। ইহার মুড়ো হইতে পা পর্যন্ত প্রায় সবই 'বাঙলামি'তে ভরপুর। আর্যামির তোয়াক্কা রাখা বাঙালির ধাতে সয় না। বাঙালীর বাচ্চা হাড়ে হাড়ে লোকায়ত।—কথাগুলো নিরেট ঐতিহাসিক

---

১ এই গ্রন্থে কয়েক বারই নীহার রায়ের উল্লেখ আছে। কিন্তু বাঙালীর ইতিহাসে বিনয়কুমারের বা তাঁর কোনো রচনার নাম চোখে পড়ল না।

প্রমাণের জোরে প্রতিষ্ঠিত করিবার দিকে গবেষণা চালানো উচিত।

-বিনয় সরকারের বৈঠকে, ১ম খণ্ড, পৃ ৫৮০-৮৩

নীহাররঞ্জনের বাঙ্গালীর ইতিহাস গ্রন্থের সারমর্মও এই আর, বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির লোকায়ত প্রকৃতিকে নিয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণের জোরে প্রতিষ্ঠিত করবার দিকেই তিনি গবেষণা চালিয়েছেন। তাঁর এই গবেষণাপ্রয়াস যে ব্যর্থ হয়নি এবং তাঁর এই প্রয়াসের ফলে বাংলার ইতিহাস রচনার পদ্ধতিতে যে একটা নূতন প্রবর্তনার আবির্ভাব হল, তাও স্বীকার করতেই হবে।

লোকবৃত্তের আপেক্ষিক গুরুত্বের প্রসঙ্গে গ্রন্থের নামটি সম্বন্ধেও দুএকটি কথা বলা প্রয়োজন। "বাঙ্গালীর ইতিহাস" নামের দ্বারাই গ্রন্থকার বোঝাতে চান যে,—এটা বাংলার জনসাধারণেরই ইতিহাস, শুধু রাজা- ও রাজবংশের নয়। এর পরোক্ষ ব্যঞ্জনা এই যে, বাঙালির ইতিহাস ও বাংলার ইতিহাস এক নয়, বাংলার ইতিহাস বলতে প্রধানতঃ তার রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্ত বা রাজবৃত্তই বোঝায়। বলা বাহুল্য এটা কিছুতেই স্বীকার্য নয়। কোনো দেশের ইতিহাস বলতে লক্ষণার দ্বারা সে দেশের অধিবাসীদের ইতিহাসই বোঝায়। যেমন, গ্রীসের ইতিহাস মানেই গ্রীক জাতির ইতিহাস। ইংরেজি সাহিত্যেও দেখি **History of England** এবং **History of the English People** অভিন্নার্থেই চলে। সংস্কৃত ভাষাতেও

তাই, বঙ্গাঃ বলতে বঙ্গ জনপদ তথা বঙ্গ জাতি উভয়কেই সমভাবে বোঝায়। বাংলার ইতিহাস বলতে শুধু যে বাংলার রাজকীয় ইতিহাস বোঝায় না, বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকে বাংলা সাহিত্যে তার বহু নিদর্শন আছে। পক্ষান্তরে ওই একই অর্থে বাঙ্গালীর ইতিহাস কথাটার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। বঙ্কিমসাহিত্যে তো আছেই, গৌড়রাজমালার ভূমিকায় অক্ষয়কুমার 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' কথাটা পুনঃপুনঃই ব্যবহার করেছেন৷ সম্ভবতঃ নীহারবাবু এই নামটা একটু স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহার করতে চান। বাংলার জনসাধারণের ইতিবৃত্ত রচনাই তাঁর অভিপ্রায়; অর্থাৎ বাঙালির ইতিহাস বা **History of the Bengali People** রচনা করতে তিনি চাননি, তিনি চেয়েছেন বাংলার লোক-পুরাবৃত্ত বা *People's History* of **Bengal** রচনা করতে। সুতরাং গ্রন্থের নামটাও তদনুসারে 'প্রাচীন বাংলার লোকবৃত্ত' বা অনুরূপ কিছু হলেই আর কারও খটকা লাগার কোনো সম্ভাবনা থাকত না। 'আদিপর্ব' কথাটা সম্বন্ধেও একটু বক্তব্য আছে। গ্রন্থের অভ্যন্তরে গুপ্তপর্ব, পালপর্ব, সেনপর্ব প্রভৃতি শব্দ পুনঃপুনঃই ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং তার সঙ্গে আদিপর্ব কথার অর্থব্যাপ্তিগত সংগতি নেই। সমগ্র ও অংশকে একই নামে অভিহিত করা বিধেয় নয় বলা বাহুল্য। আদিকাণ্ড, আদিস্কন্ধ, আদিযুগ বা অনুরূপ কিছু ব্যবহার করে গুপ্তপর্ব ব্যবহার চলতে পারত। অথবা আদিপর্ব বলে গুপ্তযুগ ইত্যাদি বলা যেত।

ভাষা

এই গ্রন্থের একটি বড় গুণ তার ভাষা। ইংরেজিতে না লিখে তিনি যে বাংলায় লিখেছেন তাতে তাঁর অভিপ্রায়গত আন্তরিকতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই জন্য তিনি বাঙালির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকবেন চিরকাল। এই গ্রন্থের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের তথা বাঙালি জাতির মর্যাদা যে কতদূর বেড়েছে তা বলে শেষ করা যায় না। ইতিহাসচর্চার মুখ্য উদ্দেশ্য নিছক জ্ঞানসাধনা বা পাণ্ডিত্যপ্রকাশ নয়; তার মুখ্য উদ্দেশ্য জাতির আত্মসংবিৎ ফিরিয়ে আনা, তাকে ভবিষ্যতের অভিমুখে প্রেরণা দেওয়া। এই উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদে বাংলার ইতিহাসচর্চার প্রবাহকে ইংরেজির খাত থেকে বাংলার খাতে সবলে পরিচালিত করেন। তারপর থেকে বাংলার ইতিহাসচর্চা অবিরাম গতিতেই বাংলার খাতে বয়ে চলেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আর-একটা ধারা ইংরেজির খাতেও চলছিল। বিংশ শতকের প্রথম দুই দশকে বোধ করি বাংলার ধারাটাই প্রবলতর ছিল এবং এই সময়ে রচিত কোনো কোনো গ্রন্থ (যেমন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, সিরাজদ্দৌলা) সাহিত্যিক মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠানের যোগ্যতাও লাভ করেছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব প্রভৃতি নানা কারণে ইংরেজির ধারাটাই অধিকতর প্রবলতা লাভ করে। অথচ ঠিক এই সময়েই হিন্দী সাহিত্যে ইতিহাসচর্চার বেগ খুবই প্রখর হয়ে ওঠে। তুলনা করলে বোধ করি এবিষয়ে বাংলা সাহিত্যের

অপেক্ষাকৃত দীনতাই স্বীকার করতে হবে। ইংরেজি ধারার আপেক্ষিক প্রাধান্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ইতিহাসচর্চাগত অভিপ্রায়েও একটা পরিবর্তন দেখা দেয়। জাতির অতীতস্বরূপ উদ্‌ঘাটনের দ্বারা তার চিত্তে আত্মোদ্‌বোধন তথা কর্মের প্রেরণা সঞ্চারের পরিবর্তে নিছক জ্ঞানসাধনা, খ্যাতির ক্ষেত্রবিস্তার প্রভৃতি নানারকম উদ্দেশ্য সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এ সময়ে বাঙালির মনকে আবার বাংলায় ইতিহাসচর্চার দিকে আকর্ষণ করবার প্রয়োজন ছিল। বস্তুতঃ সে প্রয়োজন ঐতিহাসিকমণ্ডলীতেও অনুভূত হচ্ছিল। তার প্রমাণ রমেশচন্দ্রের 'বাংলাদেশের ইতিহাস'; ইতিহাস-পরিষদের মুখপত্র ত্রৈমাসিক 'ইতিহাস'। কিন্তু এই প্রচেষ্টা অতিক্ষীণ এবং বাঙালি জাতি তথা বাংলা সাহিত্যের মর্যাদা বা প্রয়োজনের অনুরূপ নয়। নীহাররঞ্জনের গ্রন্থের দ্বারা সে মর্যাদা ও প্রয়োজন অতি সার্থকভাবেই রক্ষিত হয়েছে। দেশের ইতিহাস দেশের মনকে যে পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শক্তি জুগিয়ে থাকে, এতদিন কোনো গ্রন্থের দ্বারাই সে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়নি। ইংরেজিতে বাংলার ইতিহাস শুধু আমাদের বুদ্ধিকেই উদ্দীপ্ত করে; কিন্তু বাংলায় বাংলার ইতিহাস শুধু জাতির বুদ্ধিকে জাগিয়েই ক্ষান্ত হয় না, তার হৃদয়প্রাণকেও স্পর্শ করে। এখানেই দেশের ইতিহাস রচনার বিশেষ সার্থকতা। 'বাঙ্গালীর ইতিহাস'-এর দ্বারা সে সার্থকতা পরিপূর্ণরূপেই লব্ধ হয়েছে; এটা এই গ্রন্থের পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়।

নীহাররঞ্জন মাতৃভাষাকে তাঁর এই মহাগ্রন্থের বাহনরূপে

স্বীকার করে নিয়েছেন, এটুকুতেই তাঁর সব কৃতিত্ব নিঃশেষ হয়নি। তিনি সে ভাষাকে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন, এটাই অধিকতর কৃতিত্বের বিষয়। ইতিহাসের ভাষাও যে সাহিত্যিক গুণ- ও শক্তি-সম্পন্ন হওয়া চাই, এ কথাটা যেন আমরা কিছুকাল যাবৎ ভুলেই গিয়েছিলাম। প্রত্নতাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণের ভাষা স্বভাবতঃই সাহিত্যিক রূপ নিতে পারে না। দীর্ঘ কাল ধরে আমাদের ইতিবৃত্তচর্চা প্রত্নতত্ত্বের পর্যায়কে অতিক্রম করে যেতে পারেনি বলে তারই ভাষা ইতিহাসের ভাষা বলে একরকম সর্বজনস্বীকৃতি পেয়ে বসেছিল। অবশেষে নীহাররঞ্জন ওই সুচিরকালীন মোহাবেশের অবসান ঘটিয়ে ইতিহাসের ভাষাকে তার স্বাধিকারেই সাহিত্যমর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা দান করলেন, তাঁর এই গৌরব বাংলাসাহিত্যে অক্ষয় হয়ে রইল। একথা বললে আশা করি ভুল হবে না যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকেই বাংলা গদ্যে যথার্থ সাহিত্যিক গুণ ও শক্তি সঞ্চারিত হয়, সেই সময় থেকেই বাংলা গদ্যসাহিত্য বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠা ও মর্যাদাবৃদ্ধির প্রধান অবলম্বন হয়েছে। কিন্তু সে গদ্যসাহিত্য প্রধানতঃ রসসাহিত্য। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকেই বাংলা গদ্য গভীর চিন্তাময় সাহিত্যের বাহন হবার যোগ্যতাও অর্জন করতে শুরু করে। অতঃপর অন্যান্য মনীষীর, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের, প্রতিভাস্পর্শে ওই গদ্য চিন্তারাজ্যে দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের সহায়তাকার্যেও প্রচুর শক্তির পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু তথাপি একথা মানতে হবে যে, কথা-

সাহিত্যে বাংলা গদ্য যে সম্পদ্ সৃষ্টি করেছে তার তুলনায় চিন্তা-সাহিত্যের সম্পদ্ এখনও অতি নগণ্য অবস্থায় রয়েছে। নানা কারণের সমবায়ে বাংলার চিন্তাসাহিত্য তার এই দৈন্যদশা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বাংলা সাহিত্যের কাব্য ও কথা বিভাগের তুলনায় তার বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি বিভাগের অপরিণত অসমৃদ্ধ অবস্থা বাঙালির শুধু যে অগৌরবের বিষয় হয়ে রয়েছে তা নয়, আমাদের জাতীয় চরিত্রের তথা তার বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনেরও অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। এ বিষয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "গল্প এবং কবিতা বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে মননশক্তির দুর্বলতা এবং চরিত্রের শৈথিল্য ঘটবার আশঙ্কা প্রবল হয়েছে। এর প্রতিকারের জন্য সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা প্রবর্তন অচিরাৎ আবশ্যক। বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞান-চর্চার।" বাঙালি এখন তার শৈশবদশা ছাড়িয়ে গেছে, শুধু তরল পথ্যে আর তার পরিপুষ্টির সম্ভাবনা নেই। অথচ কঠিন পথ্যের আয়োজন বাংলা সাহিত্যে যথোচিত পরিমাণে দেখা দেয়নি। বাংলার ইতিহাসবিভাগে এই গ্রন্থখানির দ্বারা সে কলঙ্ক ঘুচেছে, একথা জোর করেই বলা যায়। যে হিন্দী সাহিত্য এতদিন বাংলাকে এ বিষয়ে পেছনে ফেলেছিল, এই গ্রন্থের দ্বারা তার মর্যাদাও অতিক্রান্ত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের সাধনায় বাংলার কথাসাহিত্য উৎকর্ষের যে স্তরে স্থাপিত হয়েছে, এই গ্রন্থ প্রকাশের দ্বারা বাংলার ইতিহাস-সাহিত্যও অচিরেই সেই

স্তরে উন্নীত হবার আশা উজ্জ্বল হয়েই দেখা দিয়েছে। তাই বাংলা সরকার যে রবীন্দ্র-পুরস্কারের দ্বারা এই গ্রন্থকে অভিনন্দিত করেছেন তা খুবই স্বাভাবিক ও সংগত হয়েছে। ওই পুরস্কারের দ্বারা শুধু যে গ্রন্থখানিকেই অভিনন্দন জানানো হয়েছে তা নয়, তার দ্বারা গ্রন্থকারকৃত প্রশস্ত তোরণপথে অনুরূপ আরও বহু গ্রন্থকে পূর্ব থেকেই 'আয়াহি' সম্ভাষণ জানিয়ে রাখা হয়েছে। অবশ্যই আশা করব যে, এই গ্রন্থখানি দীর্ঘকাল তার একক মহিমার দ্বারা বাঙালি জাতিকে লজ্জিত করে রাখবে না, তার শিখাস্পর্শে প্রদীপ্ত হয়ে অনুরূপ আরও বহু গ্রন্থ অন্ধকারের কালিমা ঘুচিয়ে বাংলার ইতিহাসবিভাগে দীপাবলীর শোভাকে উজ্জ্বল করে তুলবে। শুধু ইতিহাস নয়, বাংলার বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি অন্যান্য বিভাগেও অচিরেই এই গ্রন্থের প্রদর্শিত পথে জ্ঞানসাধকের প্রবেশ ঘটবে এই আশা কি একান্তই মরীচিকাময়? এই আশা যদি সত্য না হয় তাহলে বাংলা সাহিত্যেরও আশা নেই, বাঙালিরও আশা নেই।

একথা বলা কখনও আমার অভিপ্রায় নয় যে, এই গ্রন্থের ভাষায় বা রচনারীতিতে উৎকর্ষ সাধনের কিছুমাত্র অবকাশ নেই। বরং নানা স্থানেই সে অবকাশ সুস্পষ্ট। সে-সব ছিদ্র দেখার জন্য সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন নেই। সে-সব ছিদ্রের তালিকা করাও এই রচনার পক্ষে অনাবশ্যক। স্বমতসমর্থনের জন্য শুধু দুএকটি কথা বলাই যথেষ্ট। ভাষার দিক্ থেকে নমুনাস্বরূপ 'সন্তোক্ত' শব্দটি উল্লেখ করতে পারি। এই শব্দটি

যে নির্দোষ নয়, একথা বলা বোধ করি নিষ্প্রয়োজন। অথচ এই শব্দটি এই গ্রন্থে পুনঃপুনঃই ব্যবহৃত হয়েছে। এ-রকম আরও আছে। রচনারীতির দিক্ থেকে পুনরুক্তিবহুলতা এবং অনাবশ্যক বাগ্‌বিন্যাস অনেক সময়ই পাঠকের পক্ষে পীড়াদায়ক বলে বোধ হয়। ভবিষ্যৎ সংস্করণে বাগ্‌বিস্তার বর্জন করে ভাষাকে যদি আরও সংযত ও সংহত করা যায় তাহলে গ্রন্থের মর্যাদা ও উপযোগিতা বাড়বে বলেই আমার বিশ্বাস

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বাংলার পুরাবৃত্তচর্চায় বাঙালির পাদোনশতাব্দীব্যাপী সাধনা ও সিদ্ধির চরম পরিণতি ঘটেছে এই পুস্তকে। নানা অপূর্ণতাসত্ত্বেও এই গৌরবের অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা সম্ভব হবে না। এই গ্রন্থের চেয়ে পূর্ণতর ও নির্দোষতর গ্রন্থ অবশ্যই রচিত হবে, কিন্তু পথপ্রদর্শকের কৃতিত্ব এই গ্রন্থের থেকেই যাবে। যত সত্বর উক্ত পূর্ণতর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, ততই ভালো সকলের পক্ষেই। 'বাঙ্গালীর ইতিহাস'এর পক্ষেও, কেননা অনুগামীর আশু আবির্ভাবের দ্বারাই প্রদর্শকের মর্যাদা বাড়ে সব চেয়ে বেশি।

১৯৫১—বাঙ্গালী কোন্ পথে ? : অশোকনাথ মুখোপাধ্যায়।

নীহাররঞ্জনের বৃহৎ গ্রন্থের পরে এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি (১৩৬ পৃষ্ঠা) চোখে পড়বার মতো নয়। ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখেছেন বইখানি 'গৌড়বঙ্গের স্বাধীন অধিপতি মহারাজ শশাঙ্ক হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস মাত্র'। কিন্তু লেখক একটি বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে বইখানি লিখেছেন।

তথ্য বিষয়ে তিনি সর্বজনবিদিত ঐতিহাসিকদের উপরে নির্ভর করলেও তথ্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণে তিনি স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেছেন। 'বাংলার ইতিহাস এবং ভারতরাষ্ট্রে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য, যাহা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষ ও ভারত-বাসীকে একদিন বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল, তাহা লেখক যথাসম্ভব দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।...কি কারণ অথবা কারণগুলি বর্তমান থাকার জন্য বাঙ্গালী জাতি ক্রমশঃ বর্তমান বিলুপ্তির অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাই লেখক লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।' বস্তুতঃ 'বাঙ্গালী জাতির বিলুপ্তি-আশঙ্কায় শঙ্কিত' হয়েই তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং বইএর শেষ পরিচ্ছেদের নাম দিয়েছেন 'দীপনির্বাণ'। বর্তমানের আলোতে তিনি অতীতকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। বর্তমান ও অতীত সম্বন্ধে তাঁর অভিমতের সঙ্গে সকলে একমত হবেন আশা করা যায় না। বিশেষতঃ বাংলার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর নৈরাশ্যময় মনোভাব স্বীকার করা কঠিন। তবু একথা স্বীকার করতে হবে যে, জাতীয় বর্তমান সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধির জন্য অতীতের বিচার করবার প্রয়োজনীয়তা আছে। সে দিক্ থেকে এই বইখানিও নেহাত উপেক্ষণীয় নয়।

১৯৫৩—সন্ধ্যাকরনন্দি-কৃত 'রামচরিতম্': রাধাগোবিন্দ বসাক।

অত্যন্ত সুখের বিষয় সম্প্রতি বসাক মহাশয় এই প্রসিদ্ধ উপাদানগ্রন্থখানির একটি পূর্ণাঙ্গ বাংলা সংস্করণও প্রকাশ করেছেন। পূর্ববর্তী ইংরেজি সংস্করণটি খুবই মূল্যবান্ সন্দেহ

নেই। কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ বাংলা সংস্করণেরও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। শুধু তাই নয়, ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশের পরেও যে-সব স্থলে সংশয় থেকে গিয়েছিল, তার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই বাংলা সংস্করণের দ্বারা সংশয় নিবারণের সহায়তা হবে। বাংলার ইতিহাসের এই শ্রেষ্ঠ আকরগ্রন্থখানি বাংলাভাষায় প্রকাশিত হওয়াতে বাংলাসাহিত্যের গৌরববৃদ্ধি হল এবং আমাদের দীর্ঘকালের একটি লজ্জার কারণ ঘুচল, এ গ্রন্থ সম্বন্ধে এটাই সব চেয়ে বড় কথা।

১০

বাংলার ইতিহাস-উদ্ধারে বাঙালির আত্মনিষ্ঠা

বাংলার পুরাবৃত্তচর্চায় বাঙালির সাধনা সম্বন্ধে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৮৯৯ সালেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,—

পরের রচিত ইতিহাস নির্বিচারে আদ্যোপান্ত মুখস্থ করিয়া পণ্ডিত এবং কৃতী হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্বদেশের ইতিহাস নিজেরা সংগ্রহ ও রচনা করিবার যে উদ্‌যোগ, সেই উদ্‌যোগের ফল কেবল পাণ্ডিত্য নহে। তাহাতে আমাদের দেশের মানসিক বদ্ধ জলাশয়ে স্রোতের সঞ্চার করিয়ে দেয়। সেই উদ্যমে সেই চেষ্টায় আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের প্রাণ।

—ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, পৃ ২

রবীন্দ্রনাথের মতে সকলের চেয়ে লাভের বিষয় এই স্বাধীন

চেষ্টা, আত্মশক্তির প্রয়োগ। কাব্য- ও কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন, ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তেমনি বাঙালি স্বরাজমন্ত্রের সাধক। বাংলা সাহিত্যের সৌধ বাঙালি গড়ে তুলেছে নিজের চেষ্টায়, নিজের পুরাবৃত্তকেও উদ্ধার করেছে নিজেরই উদ্যমে। বাংলার অতীত ইতিহাস বাঙালি আবিষ্কার ও রচনা করেছে প্রায় সমগ্র-ভাবেই নিজের প্রয়াসে, এ নিয়ে বাঙালি আত্মপ্রসাদ বোধ করতে পারে। এ কথা অবশ্যই কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণীয় যে, বাংলার ইতিবৃত্তচর্চার প্রথম সূত্রপাত করেন উইলকিন্‌স্-কোলব্রুক-প্রমুখ ইংরেজ মনস্বীরা। পরবর্তী কালেও কোনো কোনো ইংরেজ (স্টুআর্ট, ব্লখম্যান, বেভারিজ, স্টেপ্‌ল্‌টন, মোনাহান প্রভৃতি) বাংলার ইতিহাস উদ্ধারে ও রচনায় সহায়তা করেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের সাধারণ ইতিহাস উদ্ধারে সমগ্র দেশ পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের কাছে যতখানি ঋণী, তার তুলনায় বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের ঋণ অতি সামান্যই। বাংলা দেশের অতীত-স্বরূপ আবিষ্কারের সাধনায় যতটুকু সিদ্ধিলাভ হয়েছে, তা হয়েছে প্রধানতঃ বাঙালির নিজের চেষ্টাতেই। এ বিষয়ে অভারতীয়ের কাছে আমাদের ঋণ খুব বেশি নয়; অবাঙালি ভারতীয়ের কাছে আরও কম, নেই বললেই হয়। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের সাধারণ ইতিহাস তথা কোনো কোনো প্রদেশের ইতিহাস রচনায় বাঙালির দান উপেক্ষণীয় নয়। এটা বাংলার অধুনাজাগ্রত মননসাধনার একটি বিশিষ্ট ফল।

ইতিহাস-সাধনায় বাঙালির এই যে আত্মশক্তিনিষ্ঠা, তার

একটি বিশিষ্ট লক্ষণ সম্বন্ধেও দু-একটি কথা বলা দরকার। সেটি এই যে, স্বদেশের ইতিহাস উদ্ধারের প্রচেষ্টা নিজের শক্তি-জাত হলেও তার প্রেরণা ও পদ্ধতি দু-ই বাঙালি পেয়েছে প্রতীচ্যের কাছে। রাজেন্দ্রলাল থেকে আজ পর্যন্ত যে-সব ইতিবৃত্তসাধক আবির্ভূত হয়েছেন তাঁরা সকলেই ইংরেজি শিক্ষায় কৃতবিদ্য এবং উইলিয়ম জোন্‌স্‌, কোলব্রুক প্রভৃতি প্রতীচ্য মনীষীদেরই উত্তরসাধক। যাঁরা একান্তভাবে ভারতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ও ভারতীয় পদ্ধতির অনুবর্তী, তাঁদের কাউকেই ইতিহাস-সাধনার ক্ষেত্রে দেখতে পাই না। এর একমাত্র ব্যতিক্রমস্থল হচ্ছেন লালমোহন বিদ্যানিধি (১৮৪৫-১৯১৬)। বোধ করি একমাত্র তিনিই ভারতীয় বিদ্যা ও পদ্ধতিতে শিক্ষিত হয়েও দেশের ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর ইতিহাস-চর্চার মুখ্যতম ফল হচ্ছে 'সম্বন্ধনির্ণয়' নামক সুজ্ঞাত গ্রন্থখানি (১৮৭৫)। বইটি তৎকালে সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছ থেকেই প্রচুর প্রশংসা লাভ করেছিল। দ্বিতীয় (১৮৯৬) এবং তৃতীয় (১৯০৯) সংস্করণে বইখানি বহুল পরিমাণেই পরিবর্ধিত হয়েছিল। এখানিই বোধ করি একমাত্র ইতিহাসগ্রন্থ যাতে ভারতীয় মনোবৃত্তি ও ভারতীয় পদ্ধতি পুরোপুরি ভাবেই অনুসৃত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় উত্থানপতন ও শাসনপদ্ধতির বিবর্তন হচ্ছে পাশ্চাত্ত্য ইতিহাসজিজ্ঞাসুর প্রধান আলোচ্য বিষয়। কিন্তু ভারতীয় মনে সমা[illegible] কথাই সব চেয়ে বেশি আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের বিষয়। সুতরাং 'সম্বন্ধনির্ণয়' পুস্তকে লালমোহন

বিত্তানিধি যে বাংলার সমাজবিন্যাসের বিষয়ই আলোচনা করেছেন, সেটাই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত।

কিন্তু লালমোহনের প্রাচ্য মনোবৃত্তিও যে কতকাংশে পাশ্চাত্ত্য প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিল তার কিছু প্রমাণ আছে। ইংরেজি আখ্যাপত্রে বইখানির যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা এই—**A Social History of the Principal Hindu Castes in Bengal**। এর থেকেই বইখানির স্বরূপ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ওই আখ্যাপত্রেই ম্যাক্‌স্ মুলারের একটি উক্তি মুদ্রিত হয়েছে। সেটি এস্থলে উদ্‌ধৃতিযোগ্য।

A people that could feel no pride in the past, in the history and literature, had lost the mainstay of its national character. When Germany was in the very depth of political degradation, it turned to its ancient literature, and drew hope for the future from the study of the past. Something of the same kind was now passing in India.

—Max Muller

বলা বাহুল্য, এই উক্তির স্মরণীয়তা আজও আমাদের পক্ষে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। লালমোহনও অনুরূপ মনোভাবের দ্বারা প্রণোদিত হয়েই এই গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন এবং অনেকখানি সাফল্যও লাভ করেছিলেন। কতখানি সাফল্য তাঁর হয়েছিল তার একটু পরিচয় দিচ্ছি। এই পুস্তকের সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন,—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি-প্রণীত এই গ্রন্থখানি ইউরোপে প্রচারিত হইলে একটা কোলাহল বাঁধিয়া উঠিত; বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া বড় প্রশংসা পড়িয়া যাইত; এবং অন্ততঃ কিছুকাল সকলের মুখে ইহার প্রশংসা শুনা যাইত। কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয়ের দুরদৃষ্টক্রমে তিনি বাঙ্গালি, বাঙ্গালা দেশে বসিয়া বাঙ্গালা ভাষায় এই পুস্তক লিখিয়া বাঙ্গালি সমালোচকের হস্তে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রশংসা দূরে থাক, কিছু সুসভ্য গালি-গালাজ খান নাই, ইহা তাঁহার সৌভাগ্য। বিদ্যানিধি মহাশয় যে পরিমাণে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালা পুস্তকে দুর্লভ; বাঙ্গালি লেখক কেহই এত পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করে না।

—বঙ্গদর্শন, ১২৮২ অগ্রহায়ণ

বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পর সুবিখ্যাত নৃতত্ত্ববিৎ রিজলি সাহেব গ্রন্থকারকে লেখেন,—

Very many thanks for sending me a copy of the second edition of your very interesting book on Castes. I have made much use of the first edition a few years ago, and I hope someday to find time to study the second.

এর থেকেই গ্রন্থখানির মূল্য অনেকটা বোঝা যাবে। কিন্তু গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও আলোচনা-পদ্ধতি আধুনিক আদর্শসম্মত নয়। ফলে সম্বন্ধনির্ণয়ের অনুসরণ করে আর কেউ বাংলার

সামাজিক ইতিহাস সংগঠনের কাজে অগ্রসর হননি। উল্লেখ-যোগ্য ব্যতিক্রম হিসাবে 'বঙ্গীয় সামাজিক ইতিহাস'-প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের নাম করা যেতে পারে। কিন্তু নানা কারণে তাঁর উক্ত গ্রন্থখানি ঐতিহাসিকদের সমাদর লাভে বঞ্চিত হয়েছে। অথচ আধুনিক আদর্শ ও পদ্ধতি অনুসারে বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনার যে বিশেষ আবশ্যকতা আছে সে বিষয়েও বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ নেই। বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনার সূত্রপাত হয় সম্ভবতঃ কোলব্রুক সাহেবের হাতে। ১৭৯৮ সালেই তিনি এশিআটিক রিসার্চেস পত্রিকায় **Enumeration of Indian Classes** নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ওই প্রবন্ধে জাতিমালা, রুদ্রযামলতন্ত্র, বৃহদ্‌ধর্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি বাংলার সমাজবিন্যাসের পরিচয় দেন (দ্রষ্টব্য **Miscellaneous Essays**, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৭৩)। তার পরে দেড় শতাধিক বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেল, কিন্তু আজ পর্যন্ত বাংলার একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ইতিহাস পাওয়া গেল না; এটা বাঙালি মনে ইতিহাস-জিজ্ঞাসার পরিচায়ক নয়, গৌরবের বিষয়ও নয়।

বাংলার সামাজিক ইতিহাসের প্রসঙ্গে এস্থলে বঙ্কিমচন্দ্রের **On the Origin of Hindu Festivals** নামক ইংরেজি প্রবন্ধটির নামও উল্লেখ করা যেতে পারে। রচনাটি তিনি ১৮৬৯ সালে **Bengal Social Science Association**এর এক সভায় পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে কিশোরীচাঁদ মিত্রের '**The**

Festivals of the Hindus' প্রবন্ধটির কথা পরোক্ষে উল্লেখ করেছেন। উৎসবাদির পরিচয়ও সামাজিক ইতিহাসের একটা বিশেষ দিক্। দুঃখের বিষয় সামাজিক ইতিহাসের এই দিক্‌টি নিয়েও আজ পর্যন্ত যথোচিত আলোচনা হয়নি।

১১

শিক্ষালয়ে বাংলার ইতিহাস

উনবিংশ ও বিংশ শতকে নবোদ্‌বুদ্ধ বাঙালি জাতি যে দুটি ক্ষেত্রে তার সাধনাকে যথার্থ সার্থকতা দান করতে পেরেছে, তার একটি সাহিত্য এবং অপরটি ইতিহাস। বলা বাহুল্য ইতিহাসের সাধনা এখনও পর্যন্ত সাহিত্যসাধনার স্তরে উন্নীত হতে পারেনি ; সাহিত্যচেতনা দেশের চিত্তে যে পরিমাণ ব্যাপ্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, ইতিহাসচেতনা তা পারেনি। তার এক কারণ আমাদের স্কুল-কলেজে ইতিহাস শিক্ষার অবশ্য-স্বীকার্যতার অভাব, দ্বিতীয় কারণ ইতিহাসচর্চায় বাংলা ভাষাকে অসপত্ন অধিকার দানে কুণ্ঠা। ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে ইংরেজির পাশে বাংলা যেন দীর্ঘকাল একটি মর্যাদাহীন গৌণতার আসনে স্থান পেয়েছিল। ফলে বাংলা কথা- ও কাব্য-সাহিত্যের ন্যায় ইতিহাস-সাহিত্য বাঙালির হৃদয়ে যথোচিত প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। বস্তুতঃ জাতীয় সাহিত্যকে সহচররূপে না পেলে ইতিহাস কখনও তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারে না। যেমন তীরের ফলা ধনুকের জ্যাশক্তির সাহায্যে লক্ষ্য বিদ্ধ

করতে পারে, তেমনি ইতিহাসও একমাত্র সাহিত্যশক্তির সহযোগিতাতেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে। যত সত্বর এই সত্য উপলব্ধি হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। নতুবা ইতিহাসচেতনাকে দেশের মনে পরিব্যাপ্ত করে দেওয়া কখনওই সম্ভব হবে না। নীহাররঞ্জন এই সত্য উপলব্ধি করেই বাংলাকে তাঁর গ্রন্থের বাহন বলে মেনে নিয়েছেন, এজন্য তিনি ভাবিকালীন বাঙালি জাতির কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি লাভ করবেন।

ইতিহাসচেতনাকে জাতির হৃদয়ে সঞ্চারিত করবার এক উপায় সাহিত্য, আর-এক উপায় শিক্ষা। বাংলার ইতিহাস এখন থেকে মুখ্যতঃ বাংলাতেই আলোচনা করতে হবে, বাঙালির মনে এই সংকল্প জাগা চাই। এ সংকল্প গ্রহণে আর বেশি বিলম্ব হবে না, এ আশা বোধ করি অন্যায় নয়। কেননা, এই মনোভাবের দক্ষিণে হাওয়া ইতিমধ্যেই কিছু কিছু বইতে শুরু করেছে। তাঁর প্রমাণ 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', তার প্রমাণ ত্রৈমাসিক 'ইতিহাস' পত্রিকা ইত্যাদি।

কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলার ইতিহাসকে স্থান দেবার এতটুকু আগ্রহ বা লক্ষণ কোথাও দেখা যায় না। অথচ আমাদের স্কুলে কলেজে বাংলার ইতিহাস অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থা না হলে সে ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গ রূপে গড়ে তোলবার সাধনাকে ত্বরান্বিত করবার কোনো উপায় নেই।

এক সময় ছিল যখন আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে বাংলার

ইতিহাস শিক্ষার নীতি স্বীকৃত হত। সে রীতি কখন কিভাবে উঠে গেল বলতে পারি না।

চার্লস্ স্টুআর্টের History of Bengal (১৮১৩) বইখানি বাংলার প্রথম ইতিহাস, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে (পৃ ২৫)। এটিতে তুর্কিবিজয় থেকে পলাশির যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস দেওয়া হয়েছে। এই বইটি যখন প্রকাশিত হয় তখনও ইংরেজ শাসকগণ এদেশের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। সুতরাং এটি ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকরূপে পরিকল্পিত নয়; তা ছাড়া এটি সে উদ্দেশ্যের উপযোগীও নয়। এদেশে নূতন শিক্ষার সূত্রপাত হয় ১৮১৭ সালে 'মহাবিদ্যালয়' বা 'হিন্দুকলেজ' প্রতিষ্ঠার সময় থেকে। কিন্তু তার পরেও অনেক কাল বিদেশী সরকার দেশে শিক্ষাপ্রসারের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেননি। যতদিন সরকারী উদ্যম দেখা দেয়নি ততদিন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছিল বেসরকারি প্রয়াসেই স্কুল সোসাইটি এবং স্কুলবুক সোসাইটির মারফত। এই বেসরকারি উদ্যমে রচিত ও প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে বাংলার ইতিহাস-বিষয়ক কোনো বইএর সন্ধান পাইনি।

বাংলার ইতিহাস : মার্শম্যান

অবশেষে ১৮৩৫ সালে সুবিখ্যাত মেকলে ও বড়লাট বেন্টিঙ্কের উদ্যমে এদেশে নবশিক্ষার দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হয়। আর, ঠিক এ-সময় থেকেই দেখি শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলার

ইতিহাস রচনার ধারা শুরু হয়েছে। এই ধারার প্রথম পুস্তক হচ্ছে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের History of Bengal (১৮৩৯)।[১] এই বইটি শিক্ষালয়ের যোগে দীর্ঘকাল বাঙালির জাতীয় মনের উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যে বইটির যথেষ্ট প্রচলন হয়েছিল তার এক প্রমাণ এই যে, ১৮৪৬ সালের মধ্যেই এটির ছয়টি সংস্করণ হয়।[২] শুধু ইংরেজি নয়, তার বাংলা সংস্করণেরও যে প্রচুর কাটতি ছিল তার প্রমাণ আছে। সেকথা একটু পরেই বলব। এস্থলে মূল বইটির একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। বইটির পুরো নাম **Outline of the History of Bengal compiled for the use of youths in India**। বইএর ভূমিকায় (১৮৩৮, ডিসেম্বর ২৭) মার্শম্যান লেখেন—

The compiler presents the present work to the Instructors of youth with much diffidence. He was informed that the style of the Brief Survey of History and the

---

১ জন ক্লার্ক মার্শম্যান একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক। বাংলার ইতিহাস রচনার পূর্বে তিনি History of India (প্রথম সংস্করণ ১৮৩১) এবং Brief Survey of History (১৮৩৩) নামে দুইখানি বই প্রণয়ন করেছিলেন। দুইখানিই শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত এবং ছাত্রপাঠ্য। প্রথমোক্ত বইটি (ভারতবর্ষে ইংরেজের আগমন থেকে লর্ড হেষ্টিংসের শাসনকালের শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিক বিবরণ ছিল প্রথম সংস্করণে) বহুকাল পর্যন্ত প্রামাণিক গ্রন্থ বলে গণ্য হত এবং গ্রন্থকারের জীবনকালেই তার অনেক সংস্করণও হয়েছে। তাঁর আর-একখানি সুপরিচিত ও মূল্যবান্ বই হচ্ছে The Life and Time of Carey Marshman and Ward (১৮৫৯)। তাঁর বাংলার ইতিহাসখানিও শ্রীরামপুর থেকেই প্রকাশিত।

২ ১৮৪৬ সালে প্রকাশিত ষষ্ঠ সংস্করণের একখণ্ড বই আছে কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে।

History of India was adapted only for the youths in the higher classes, and that a book in easier language was desirable... Therefore he determined to make the experiments of providing a work for the tender capacities of those who were but feeling their way to our language...

It presents a brief and simple outline of the History of Bengal from the Voidya dynasty to the olcse of Lord William Bentinck's administration. This is a history *with which every lad in Bengal should be familiar* and the compiler would fain hope that the interest of the subject may be found some compensation for the mode in which it has been treated.

বাঙালি ছাত্রের পক্ষে বাংলার ইতিহাস জানার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গ্রন্থকারের অভিমত বক্রাক্ষরে নির্দিষ্ট করে দিলাম। এই ইতিহাস রচনায় লেখক যে-সব বই থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন, ভূমিকায় তার তালিকাও দিয়েছেন। তার মধ্যে **Stewart's History of Bengal, Seir Mutakherin** এবং **Brigg's Ferishta** এই তিনখানির নাম করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

স্টুআর্টের বইএর সঙ্গে মার্শম্যানের বইএর পার্থক্যটা লক্ষণীয়। প্রথমটিতে আছে তুর্কিবিজয় থেকে পলাশির যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলাদেশের শুধু মধ্যযুগের. ইতিহাস, তার পূর্ব বা পরবর্তী ইতিহাস তাতে নেই। মার্শম্যানের বইখানি অপেক্ষাকৃত ছোট (প্রায় আড়াই শো পৃষ্ঠার), কিন্তু তাতে তুর্কিপূর্ব ও আধুনিক যুগের ইতিহাস যথাসাধ্য বিবৃত হয়েছে। বইটির মোট

উনিশ পরিচ্ছেদের মধ্যে পাঁচ পৃষ্ঠার একটিমাত্র পরিচ্ছেদেই তুর্কিপূর্ব যুগের ইতিহাস সমাপ্ত হয়েছে। স্টুআর্টের বইতে তাও নেই। এই পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়গুলি এই—**Obscurity of the early history of Bengal, The three ancient capitals—Gour, Sonargong and Satgong, Adisoor, Bullal Sen and the Voidya roll of kings. Ancient Divisions of Bengal**। ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত বাংলার তুর্কিপূর্ব যুগের ইতিহাস ওই পাঁচ পৃষ্ঠার বেশি অগ্রসর হতে পারেনি। আর বর্তমানে সেই ইতিহাস লিখতেই প্রায় হাজার পৃষ্ঠার প্রয়োজন হয়, নীহাররঞ্জনের গ্রন্থই তার প্রমাণ। অতঃপর মধ্যযুগের ইতিহাস (১২০৩-১৭৫৭) বিবৃত হয়েছে দশ পরিচ্ছেদে। আর বাকি আট পরিচ্ছেদ লেগেছে ইংরেজের ইতিহাস (১৭৫৭-১৮৩৫) বর্ণনা করতে।

বাংলা দেশের এই ধারাবাহিক ইতিহাসটি দীর্ঘকাল আমাদের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনার আদর্শরূপে গণ্য ছিল।

বাংলা সাহিত্যে বাংলার ইতিহাসচর্চার সূত্রপাতও হয় এই গ্রন্থের অনুবাদের দ্বারা। আর, ওই অনুবাদের দ্বারাই দীর্ঘকাল ধরে বাংলা ভাষায় স্বদেশের ইতিহাসের অভাব মেটাবার চেষ্টা হত। লঙ সাহেবের ক্যাটালগে (১৮৫৫) 'বঙ্গদেশ পুরাবৃত্ত' নামে মার্শম্যানের বইএর একটি বঙ্গানুবাদের উল্লেখ দেখা যায়, অনুবাদক জনৈক **Wenger** (প্রকাশক স্কুলবুক সোসাইটি)। তিনি তৎকালে বাংলা ব্যাকরণ প্রভৃতি পাঠ্য পুস্তকের রচয়িতা

হিসাবে পরিচিত ছিলেন। লঙের তালিকায় 'বঙ্গদেশ পুরাবৃত্ত' বইটির তারিখ নেই। কিন্তু এটিকে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম বাংলার ইতিহাস বলে সম্ভবতঃ নির্দিষ্ট করা যায় না। বোধ করি সে। [illegible] অধিকারী গোবিন্দ সেনের বাঙ্গালার ইতিহাস।

১৮৪০ সালে গোবিন্দচন্দ্র সেন মার্শম্যানের বইটিকে বাংলায় ভাষান্তরিত করেন। এই গোবিন্দ সেন ছিলেন ১৮৩৮ সালে তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ নব্যদলের উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার (Society for the Acquisition of General Knowlege) অন্যতম সদস্য, এবং এই সভায় তিনি ভারতীয় ইতিহাস নিয়েই আলোচনা করতেন। দ্রষ্টব্য 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', সপ্তম পরিচ্ছেদ। ১৮৩৯ সালে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। গোবিন্দ সেনের 'বাঙ্গালার ইতিহাসে' মার্শম্যানের গ্রন্থের মতোই আদিকাল থেকে 'বেন্টিঙ্কের অধিকারের শেষ' (১৮৩৫) পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস বর্ণিত হলেও তাতে তুর্কিপূর্ব যুগের বিবরণ প্রায় কিছুই নেই বললেই হয় এবং কার্যতঃ তুর্কি-বিজয়কাল (১২০৩) থেকেই ইতিহাসের বিবরণ আরম্ভ হয়েছে। গ্রন্থপ্রকাশের তারিখ ও ভূমিকা থেকে মনে হয় বাংলা ভাষায় এটিই সর্বপ্রথম বাংলার ইতিহাস।[১] ভূমিকাতে বলা হয়েছে—

---

১ বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের ইতিহাস মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের 'রাজাবলি' (১৮০৮)। এটি ১৮৩৮ পর্যন্ত সুপ্রচলিত ছিল। পঞ্চম সংস্করণ হয় ১৮৮৯ সালে।

"দেশহিতৈষি বিজ্ঞব্যক্তিমহাশয়দিগের প্রতি গ্রন্থকারের বিনয়পুরঃসর এই নিবেদন যে সন্তানাদির স্মরণার্থে এদেশীয় পুরাবৃত্ত লিপিবদ্ধ না থাকাতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, এবং যে কোন বৃত্তান্তের মৌখিক শ্রবণমাত্র তাহাতে স্থানে ২ এমত মিথ্যা ও বৈপরীত্য হইয়াছে যে সত্যমিথ্যা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য হয়, এবং অন্যান্য ভাষায় এবিষয়ের যে সকল লিখিত আছে তাহাও শ্রেণীমতে ও সম্পূর্ণরূপে নাই, অতএব মার্সম্যান সাহেব অনেক পরিশ্রমে ইংরাজি ভাষায় এদেশীয় ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি অনেক লোক ইংরাজি ভাষায় অজ্ঞ থাকাতে তাঁহাদের উপকারার্থে আমি এই গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত করিলাম।"

মনে হয় বইখানি রচনার উদ্দেশ্য অনেকাংশেই সফল হয়েছিল। কেননা দুই বৎসর পরেই এটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন হয় (১৮৪২)।[১] এই সংস্করণের পরিচয়পত্রে আছে, 'ইংরাজি হইতে অনুবাদিত হইয়া সংবাদপ্রভাকর যন্ত্রে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইল।'

কিন্তু বইটির ভাষা ছিল কঠিন ও ইংরেজিগন্ধি। ফলে মার্শম্যানের ইংরেজি বইটির নূতন অনুবাদের প্রয়োজন হয়। হয়তো এ সময়ই Wenger-এর 'বঙ্গদেশপুরাবৃত্ত'-নামক পূর্বোক্ত বইখানি প্রকাশিত হয়। মনে হয় তাতেও উদ্দিষ্ট প্রয়োজন যথোচিতভাবে সিদ্ধ হয়নি। এবার এই অনুবাদকার্যে অগ্রসর হলেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস'

১ দ্বিতীয় সংস্করণের একখণ্ড বই আছে প্রেসিডেন্সি কলেজ লাইব্রেরিতে।

গোবিন্দচন্দ্র সেন-কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস : নামপত্র

HISTORY.

OF

BENGAL,

TRANSLATED INTOBENGALI,

BY.

GOBINDCHUNDERSEN

বাঙ্গালারইতিহাস।

ইংরাজি হইতে অনুবাদিত হইয়া

কলিকাতা সংবাদ প্রভাকর যন্ত্রে দ্বিতীয়বার মদ্রিত হইল

বাং সন ১২৪৮ শাল

ইং১৮৪২শাল

"অস্মদ্দেশীয় ভাষায় অস্মদ্দেশীয় ইতিহাস এই প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ হইল"—জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৪০ মার্চ ৭ ॥ ১৬৫ পৃষ্ঠা।

College of Fort William

[illegible] নায় কালিজ ফার্ট যলিয়ম

পুস্তক কালেজ ফোর্ট উলিয়ম

ফোর্ট উইলিঅম্ কলেজের গ্রন্থাগারে গোবিন্দচন্দ্র সেনের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থ প্রথম রক্ষিত ছিল।

দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৪৮ সালে। এই পুস্তকে পলাশির যুদ্ধ থেকে লর্ড বেন্টিঙ্কের আমল পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।

এই সময়ে বিদ্যালয়গুলিতে বাংলার ইতিহাস যে পাঠ্যরূপে সুপ্রচলিত ছিল, মার্শম্যানের বইটি ও তার অনুবাদবাহুল্যই তার একটি প্রমাণ। অন্য প্রমাণও আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নায়কতায় 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪০ সালে। পাঠাশালাটি সাত-আট বৎসর বিদ্যমান ছিল। এই বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয় ও পুস্তক দেবেন্দ্রনাথের আদর্শ অনুসারেই স্থির করা হত। ১৮৪৪ সালের পাঠ্যতালিকা থেকে জানা যায় যে, পাঠশালার সর্বোচ্চ দুই শ্রেণীতেই পাঠ্য ছিল **History of Bengal**, এবং তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠ্য ছিল মনোরঞ্জন ইতিহাস[১] (সাহিত্যসাধক-চরিতমালা, ৪৫)। প্রথমখানি সম্ভবতঃ মার্শম্যানের মূল ইংরেজি বই; তখনও বিদ্যাসাগরের অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন ১৮৪৯ সালে হুগলিকলেজের স্কুলশাখার নিম্ন বিভাগে ভরতি হন তখন অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে 'বঙ্গেতিহাস'ও তাঁর পাঠ্য ছিল, এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই 'বঙ্গেতিহাস' কার প্রণীত বলতে পারি না। এ সময় থেকেই বাংলার ইতিহাসের অপূর্ণতার কথা বঙ্কিমচন্দ্রের মনে মুদ্রিত হয়ে যায়, একথা মনে করা অসমীচীন নয়।

ঈশ্বরচন্দ্রের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' দ্বিতীয় ভাগ সম্পর্কে ১৮৫৫ সালে লঙ সাহেব মন্তব্য করেন, "**We understand**

১ দ্রষ্টব্য গ্রন্থের তালিকা এবং সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ড (১৩৩৮), পৃ ৭৯১ পাদটীকা।

the history of the Ante-English period is in preparation taken from the first chapter of Marshman"। অতঃপর রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে। "ইহাতে বৈদ্যবংশীয় হিন্দু রাজাদিগের চরমাবস্থা অবধি নবাব আলিবর্দি খাঁর অধিকারকাল পর্যন্ত বাঙ্গালাদেশের প্রসিদ্ধ ঘটনাসকল সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে"। দ্রষ্টব্য সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৩৯, পৃ ৩১। এই বইটির সম্পর্কে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র গিরীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধক্রমে ১৮৫৯ অব্দে ইনি বাঙ্গালা ইতিহাসের প্রথম ভাগ ইংরাজি হইতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন; এই ইতিহাস পুস্তকখানি বালকপাঠার্থী-দিগের পক্ষে এত উপযোগী হয় যে, পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় এইখানিকেই বাঙ্গালা ইতিহাসের প্রথম ভাগ স্বীকার করিয়া পরবর্তী ঘটনা অবলম্বনে বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ রচনা করেন[১] এবং তৎপরবর্তী ঘটনাসমূহ অবলম্বনে পূজ্যপাদ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত ইতিহাসের তৃতীয় ভাগ রচনা করিয়াছেন। এই তিনখানি পুস্তক একত্রে একখানি সম্পূর্ণ এবং অতি সুন্দর বাঙ্গালার ইতিহাস পুস্তক হইয়াছে।

—বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব, তৃতীয় সং; সূচনা, পৃ ৪

১ এখানে বাঙ্গালার ইতিহাসের দুই ভাগের কালক্রম ঠিক হয়নি। দ্বিতীয় ভাগ রচিত হয়েছিল প্রথম ভাগের (১৮৫৯) বহু পূর্বে ১৮৪৮ সালে।

ভূদেবের 'বাঙ্গালার ইতিহাসে' (তৃতীয় ভাগ) লর্ড বেন্টিঙ্কের পরবর্তী কাল থেকে ছোট লাট লর্ড বীডনের (১৮৬২-৬৭) শাসন-কাল পর্যন্ত বাংলার ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয় কিন্তু বইটি প্রকাশিত হয় দীর্ঘকাল পরে ১৯০৩ সালে। তার বহু পূর্বে ১৮৭৪ সালে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রকাশিত হয়। এটির সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "ঈদৃশ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাস বোধ হয় আর নাই।... বালকশিক্ষার্থ যে সকল পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় নিত্য নিত্য প্রণীত হইতেছে, তন্মধ্যে ইহার ন্যায় উত্তম গ্রন্থ অল্প" (বঙ্গদর্শন, ১২৮১ মাঘ)। বোঝা যাচ্ছে সে সময়ে বাংলার বিদ্যালয়-গুলিতে বাংলার ইতিহাসের পঠন-পাঠন প্রচলিত ছিল, এবং তার ফলে নিত্য নিত্যই বিদ্যালয়পাঠ্য বাংলার ইতিহাস প্রণীত হত এবং প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাসের ন্যায় 'সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ উত্তম গ্রন্থ' প্রকাশেরও সুযোগ ঘটত। বস্তুতঃ ঈশ্বরচন্দ্র ও রামগতির গ্রন্থদ্বয়ের পর থেকেই উক্ত পঠন-পাঠনের চাহিদা মেটাবার জন্যই অজস্র বাংলার ইতিহাস রচিত হতে থাকে। এ সমস্ত বিদ্যালয়পাঠ্য বাংলার ইতিহাস পুস্তকের পরিচয় দেওয়া সম্ভবও নয়, আবশ্যকও নয়। তবে এই সময়ে আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে বাংলার ইতিহাসের পঠন-পাঠন কত ব্যাপক ছিল তার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। রাজকৃষ্ণের বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সালে। আর, তার চতুস্ত্রিংশ

সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ সালে।[১] বারো বছরে চৌত্রিশ সংস্করণ যেমন বইটির জনপ্রিয়তার পরিচায়ক তেমনি বাংলার ইতিহাস পঠন-পাঠনের ব্যাপকতারও পরিচায়ক। এখানে বলে রাখা যেতে পারে যে, ১৮৮৬ সালেই মাত্র একচল্লিশ বৎসর বয়সে রাজকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। রাজকৃষ্ণের পর এস্থলে রজনীকান্ত গুপ্তের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৯৯) বইখানির উল্লেখ করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। কেননা, বিদ্যালয়পাঠ্য বলে আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও প্রখ্যাতনামা ঐতিহাসিকের রচনা বলে এখানি স্বভাবতঃই অনেকখানি বিশিষ্টতার অধিকারী।

এভাবে বিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকরচয়িতাকে আশ্রয় করেই দেশের মধ্যে বাংলার ইতিহাসের চর্চা ও চেতনা প্রসার লাভ করতে থাকে। ওই চেতনার গভীরতা কম হতে পারে, কিন্তু তার ব্যাপ্তি উপেক্ষণীয় নয়। আমাদের বাল্যকালে বিংশ শতকের প্রথম দশকেও আমাদের ইস্কুলগুলিতে বাংলার ইতিহাস পড়াবার রীতি দেখেছি এবং ও-রকম পাঠ্যপুস্তক পড়বার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। বস্তুতঃ বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে আমার প্রথম চেতনাও জাগে ও-রকম কয়েকখানি পাঠ্য পুস্তক থেকেই। ও-রকম দুএকখানি বই আজও আমার কাছে সযত্নে রক্ষিত আছে। অতঃপর কখন যে আমাদের ছাত্র, শিক্ষক ও লেখকসমাজের কাছ থেকে বিদ্যালয়পাঠ্য বাংলার ইতিহাস

১ প্রথম সংস্করণের একখানি বই আছে ইন্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে এবং চতুস্ত্রিংশ সংস্করণের একখানি বই আছে কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে।

বিলুপ্ত হয়ে গেল জানি না। কিন্তু তার ফল যে ভালো হয়নি তা নিঃসন্দেহ। চল্লিশ বৎসরের ঊর্ধ্বকাল যাবৎ বৃহৎ শিক্ষার্থি- ও শিক্ষক-সমাজের সামনে নিত্যবিদ্যমান না থাকায় ফলে বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে জাতীয় সচেতনতা সংকীর্ণ ও অগভীর হয়ে এসেছে। গবেষক- ও প্রত্নবিৎ-মণ্ডলীর মনে হয়তো ওই চেতনা স্পষ্টতর ও গভীরতর হয়েছে, কিন্তু দেশের মধ্যে যদি তার ব্যাপক প্রতিষ্ঠা না হয় তবে ইতিবৃত্তচর্চার সার্থকতা কি? যদি দেশে ইতিহাসকে সার্থক করে তুলতে হয়, যদি ইতিহাসের শক্তিকে জাতির চিত্তে প্রেরণা জোগাবার কাজে লাগাতে হয়, তবে আমাদের স্কুল-কলেজে বাংলার ইতিহাস পঠন-পাঠনের নীতি পুনঃপ্রবর্তন করতেই হবে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশেই ভারতবর্ষের সাধারণ ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক ইতিহাসও পাঠ্য হওয়া চাই প্রাদেশিক ভাষার যোগেই। নতুবা ভারতবর্ষের প্রত্যেক অঙ্গে যথেষ্টপরিমাণে প্রাণশক্তির সঞ্চার হতে পারবে না। ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে যেমন দেশের ইতিহাসকে ভিত্তি করেই ইউরোপের ইতিহাস শেখাবার ব্যবস্থা হয়, আমাদের দেশেও তেমনি প্রাদেশিক ইতিহাসকে অবলম্বন করেই সর্বভারতীয় ইতিহাসশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ছাত্র, শিক্ষক এবং পাঠ্যগ্রন্থরচয়িতা মহলে যেদিন ব্যাপকভাবে বাংলার ইতিহাস চর্চার সাড়া পড়ে যাবে সেদিনই বঙ্কিমের স্বপ্ন সফল হবে, সেদিনই বাঙালির পুরাবৃত্তসাধনাও সিদ্ধি লাভ করবে।

ঊনবিংশ শতকে বাঙালি আত্মশক্তির সন্ধান পায় সাহিত্য-

সৃষ্টিতে, বিংশ শতকে তার আত্মোপলব্ধি নূতন রূপ পেয়েছে দেশের পুরাবৃত্তউদ্ধারে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উচ্চতম স্তরেও বাংলাসাহিত্যকে তথা তার ইতিহাসকে যথোচিতভাবে স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি, কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসের পক্ষে ওই শিক্ষামন্দিরের দ্বার আজও অবরুদ্ধ বহুকাল পূর্বে (১৮৯৯) অক্ষয়কুমার লিখেছিলেন,—

ইতিহাসের উপকরণ এখনও সংকলিত হয় নাই, অথচ শিশুপাঠ্য ইতিহাস রচনার বিরাম নাই। তাহাতে কত ঐতিহাসিক ভ্রমপ্রমাদ বালকবালিকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে। তাহারা যাহা বহুযত্নে কণ্ঠস্থ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অর্জন করিতেছে তাহার চরম ফল—আত্মাবমাননা বাঙ্গালার ইতিহাসেই ইহা অধিকতররূপে পরিস্ফুট হইতেছে

—ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, পৃ:

দেখা গেল অন্ততঃ ১৮৪০ সাল থেকে ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত এবং তার পরেও আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে বাংলার ইতিহাস পড়াবার রীতি প্রচলিত ছিল, এবং সে ইতিহাসের ভাষা ছিল বাংলা। গোবিন্দচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামগতি ন্যায়রত্ন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি ছিলেন তার লেখক।

এই সময়ের প্রথম দিকে ইস্কুলের প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে বাংলার ইতিহাস বাংলাতেই পড়ানো হত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীগুলিতে ইংরেজিতে পড়াবার রীতি প্রচলিত ছিল বলে

মনে হয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদে বাংলার ইতিহাস বঙ্গবিদ্যালয়ে পড়ানো হত বাংলায় এবং ইংরেজি ইস্কুলে ইংরেজিতে। এই সময়ে ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতে লিখিত স্কুলপাঠ্য বাংলার ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 'প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৭৪) এবং রজনীকান্ত গুপ্তের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৯৯), এই দুখানি বইএর কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখন দুএকখানি ইংরেজি বইএর পরিচয় দিচ্ছি।

বাংলার ইতিহাস: লেথব্রিজ

১৮৭৫ সালে (বঙ্গদর্শন, ১২৮১ মাঘ) বঙ্কিমচন্দ্র বলেন,—যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্তি, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধচরিত ও গীতগোবিন্দ রচিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই। মার্শমান, স্টুয়ার্ট প্রভৃতি প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি। সে কেবল সাধ-পূরাণ মাত্র।

—বাঙ্গালার ইতিহাস, বিবিধ প্রবন্ধ (২য় ভাগ)

অতঃপর ১৮৮০ সালে (বঙ্গদর্শন, ১২৮৭ অগ্রহায়ণ) তিনি আবার বলেন,—

বাঙ্গালার ইতিহাস আছে কি? সাহেবেরা বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে ভূরি ভূরি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। স্টুয়ার্ট সাহেবের

বই এত বড় ভারী বই যে ছুঁড়িয়া মারিলে জোয়ান মানুষ খুন হয়, আর মার্শমান লেথব্রিজ প্রভৃতি চুটকিতলে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখে অনেক টাকা রোজগার করিয়াছেন। কিন্তু এ সকলে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক কোনো কথা আছে কি? আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরেজি গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই।

—বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, ঐ

স্টুআর্ট ও মার্শম্যানের বইএর কথা আগেই বলা হয়েছে। এখানে লেথব্রিজের বইএর পরিচয় দিচ্ছি। স্কুলপাঠ্য থাকার ফলে বইটি এক সময়ে সুপরিচিত ছিল। অথচ তার দ্বারা যথার্থ ইতিহাসের অভাবপূরণ হত না। তাই রবীন্দ্রনাথকেও পরবর্তী কালে এর সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করতে হয়েছিল।

রোপার লেথব্রিজ (Roper Lethbridge) ১৮৬৮ সালে বাংলা দেশে এসেই ইতিহাসের অধ্যাপক রূপে সরকারি কর্ম গ্রহণ করেন। কলকাতা প্রেসিডেন্‌সি কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজে তিনি দীর্ঘকাল ইতিহাসের অধ্যাপনাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এক সময়ে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষপদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। কৃষ্ণনগরে রামতনু লাহিড়ীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা হয়। লাহিড়ী মহাশয়ের মৃত্যুকাল (১৮৯৮) পর্যন্ত সে বন্ধুতা অব্যাহত ছিল। পরবর্তী কালে তিনি শিবনাথ শাস্ত্রী-প্রণীত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থের ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করেন (১৯০৭), সে কথা যথাস্থানে বলা হয়েছে।

লেথব্রিজের বইখানির পুরো নাম **An Easy Introduction to the History and Geography of Bengal**; নামের নীচে আছে **For Junior Classes in Schools**।[১] প্রকাশক—**Thacker, Spink & Co. (Calcutta), Publishers to the Calcutta University**। গ্রন্থের ভূমিকায় দেওয়া স্থান ও তারিখ **Krishnagar College, 1 July 1874**। গ্রন্থকার এই সময়ে কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ। বইখানির পৃষ্ঠাসংখ্যা মাত্র এক শো আঠারো, অধ্যায়সংখ্য নয়। প্রথম অধ্যায়ে আছে বাংলার ভৌগোলিক বিবরণ; দ্বিতীয় অধ্যায়ে হিন্দুরাজত্বের, পরবর্তী পাঁচ অধ্যায়ে মুসলমান-রাজত্বকালের এবং শেষ দুই অধ্যায়ে ইংরেজ-রাজত্বকালের ইতিহাস। ১৮৫৪ সালে (ডালহৌসির অধিকারকালে) বাংলা প্রদেশকে লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীনে স্থাপন পর্যন্ত ইতিহাসের ধারা অনুসৃত হয়েছে এই পুস্তকে। অতঃপর প্রথম লেফটেনেণ্ট গবর্ণর সার ফ্রেডারিক হ্যালিডে থেকে সার রিচার্ড টেম্পল (১৮৭৪) পর্যন্ত বাংলার শাসনকর্তাদের একটি তালিকা মাত্র দেওয়া হয়েছে।

এই গ্রন্থ রচনায় লেখক যে-সব ঐতিহাসিকের রচনা থেকে সাহায্য পেয়েছেন তাঁদের নামও উল্লেখ করেছেন ভূমিকায়—হিন্দুযুগ সম্পর্কে **Professor Lassen**, রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং **E. V. Westmacott**; মুসলমান-রাজত্ব সম্পর্কে **Henry**

১ দুই কপি বই আছে কৃষ্ণনগর কলেজ লাইব্রেরিতে।

Elliot, Professor Blochmann, E. Thomas এবং **Professor Dowson**; ব্রিটিশ-রাজত্ব সম্পর্কে **Hunter, Toyanbey**, কিশোরীচাঁদ মিত্র এবং **Westmacott**। মুসলমান-রাজত্বকাল সম্পর্কে স্টুআর্টের বইএর উপরেই গ্রন্থকার বিশেষ ভাবে নির্ভর করেছেন। গ্রন্থরচনার আদর্শ সম্পর্কে লেখক ভূমিকায় বলেছেন,—

I have prepared this little book especially for the use of the younger boys in our English-teaching schools; and have been most careful to use only the simplest and easiest language throughout. I have also endeavoured to make the account as pleasing as possible to youthful minds by omitting all dry and uninteresting details and by inserting a good many illustrative anecdotes and stories derived chiefly from Firishtah.

এই 'চুটকিতালে'র বইখানি বঙ্কিমকর্তৃক নিন্দিত হলেও তার বিস্তৃত পরিচয়ই দিলাম। কারণ ইস্কুলের পাঠ্য পুস্তকরূপে এখানি দীর্ঘকাল আমাদের শিক্ষিতসমাজের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং বাংলার ইতিহাস বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনার আদর্শ বলে স্বীকৃত হয়েছিল।

এস্থলে বলা প্রয়োজন যে, বঙ্কিমনিন্দিত লেথব্রিজের বাংলার ইতিহাস এবং বঙ্কিমপ্রশংসিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম-শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' দুখানি বই-ই প্রকাশিত হয়েছিল একই বৎসরে (১৮৭৪)।

বাংলার ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত

ইংরেজি ভাষায় লিখিত আর-একখানি বাংলার ইতিহাস পুস্তকের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। সেখানির রচয়িতা স্বনামখ্যাত রমেশচন্দ্র দত্ত। রমেশচন্দ্রের বাংলার ইতিহাসখানির প্রসঙ্গ উত্থাপনের পূর্বে তাঁর *Peasantry of Bengal* (১৮৭৪) বইটির কথা একটু বলা দরকার। বইটির নামপত্রেই তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বইটির পুরো নাম এই—*The Peasentry of Bengal* **being a view of their condition under the Hindu, the Mahomedan and the English Rule, and a consideration of the means calculated to improve their future prospects**। বইখানির মুখ্য উদ্দেশ্য বাংলার কৃষক সমাজের দুর্দশা বর্ণনা ও তার প্রতিকারের উপায় নির্দেশ। ওই দুর্দশার হেতু-নির্ণয়ের প্রয়োজনেই গ্রন্থকার বাংলার কৃষকের চিরাগত ইতিহাস বিবৃত করেছেন সংক্ষেপে। কৃষকসমাজের ইতিহাস এই গ্রন্থের পক্ষে গৌণ হলেও আমাদের পক্ষে তার মূল্য কম নয়। কেননা, দেশের কৃষকসম্প্রদায়ের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার সূত্রপাত বোধ করি এই গ্রন্থেই হল। তা ছাড়া, এর দ্বারাই গ্রন্থকারের ঐতিহাসিক দৃষ্টির একটি বিশিষ্টতাও প্রকাশ পায়। সে বিশিষ্টতা এই যে, রমেশচন্দ্রের হৃদয় ও দৃষ্টি সমাজের শুধু উপরের স্তরেই নিবদ্ধ ছিল না, নিম্নস্তরে জনসাধারণের প্রতিই আকৃষ্ট ছিল বিশেষভাবে। তাঁর বিদ্যালয়পাঠ্য ক্ষুদ্রকায় বাংলার ইতিহাসখানিতেও তাঁর এই দৃষ্টিগত বিশিষ্টতার ছাপ সুস্পষ্ট।

রমেশচন্দ্রের বাংলায় ইতিহাসখানির পুরো নাম **A Brief History of Ancient and Modern Bengal for the use of the schools**। ১৮৯২ সালে প্রকাশিত। বইটি লেথব্রিজের বইএর মতোই ক্ষুদ্রাকৃতি ও ক্ষুদ্রায়তন (মাত্র ১০৪ পৃষ্ঠা) এবং ইংরেজি বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর জন্য অভিপ্রেত। কিন্তু রচনার অভিপ্রায়ে ও পরিকল্পনায় এটি লেথব্রিজের বই থেকে অনেকাংশেই পৃথক্ এবং এদেশের শিশুশিক্ষার্থীদের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। ফলে এই বইখানির দ্বারা শিক্ষাজগতে লেথব্রিজের বইএর দীর্ঘকালীন একাধিপত্য অনেকখানি প্রতিহত হয়েছিল।

নামে বাংলার ইতিহাস হলেও বিহার এবং উড়িষ্যার বিবরণও অনেকাংশেই এই পুস্তিকায় পাওয়া যায়। কারণ তৎকালীন রাষ্ট্রীয় প্রদেশবিভাগ অনুসারে বিহার-উড়িষ্যা বাংলার অন্তর্গত বলেই গণ্য হত। বইএর শেষে একখানি মানচিত্র আছে; তাতেও বাংলার এই বৃহত্তর পরিধি দেখানো হয়েছে: একদিকে আসাম এবং অপরদিকে বিহার ছোট নাগপুর ও উড়িষ্যা। ইতিহাসের বিবরণ তিন যুগে বিভক্ত: হিন্দুযুগ (প্রথম থেকে ১২০৩ পর্যন্ত), মুসলমান যুগ (১২০৩-১৭৫৬) এবং ব্রিটিশ যুগ। প্রত্যেক যুগের ইতিহাসই পাঁচটি করে অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে। বইটির ভূমিকা থেকেই তার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট প্রতিভাত হয়।—

The special object of this little book is to place in the hands of all Bengali students who learn the English

language a connected and clear history of the *People of Bengal* [[illegible]] from the earliest times to the present day. The political history of the country has been fully told in the following pages, but I have also taken care to narrate as fully and clearly as I could within my limits, the condition of the people, their literature and philosophy, their agriculture, commerce and arts, their state and progress in different periods.

For a Hindu boy the history of Bengal should not commence with the conquest of that country by Bakhtiyar Khilji...I have considered it necessary to narrate these facts of the Hindu Period in five chapters in order that some recollections of these facts may live in the minds of all educated Hindus long after they have ceased to be students.

Five chapters have been devoted to the Mahommedan Period and I have mainly relied in this portion of the work on Stewart's History of Bengal which is based on the Persian works of Mahommedan Historians. Later works have also been consulted. In one of these five chapters I have narrated the material condition of the people, their literature and philosophy, their agriculture and trade, and their political condition and status under the Mahommedan rule. *An account of kings and wars is useless and barren unless we have also an account of the people and their condition and their progress.*

The British rule in Bengal has also been narrated in five chapters, and the culture and progress of the people under this rule has been carefully narrated in these chapters.

It is hoped that the work designed and executed on this plan will meet the requirements of all Bengali students. The book is written in easy language, being designed *for the use of boys of the lower classes of High English Schools.* To them it will serve *as an introduction to the History of India which they have to study in the higher classes.*

ব্রিটিশ যুগের ইতিহাসে একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক শাসনকর্তার শাসনকালের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সংস্কৃতি এবং উন্নতির সংক্ষিপ্ত বিবরণও দেওয়া হয়েছে। দেশের জনসাধারণের সুখদুঃখ উন্নতিঅবনতির বিবরণ দিয়ে ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গ করবার প্রয়াস এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির সর্বত্রই বিদ্যমান। ভূমিকাটুকু পড়লেও একথার সত্যতা উপলব্ধি হয়। তাই ভূমিকা থেকে গ্রন্থকারের উক্তি একটু বিস্তৃতভাবেই উদ্‌ধৃত করলাম। রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক আদর্শ, গ্রন্থরচনার অভিপ্রায় এবং তৎকালে বিদ্যালয়গুলিতে বাংলার ইতিহাস পড়াবার ব্যবস্থা যে-সব উক্তিতে বিশেষভাবে পরিস্ফুট সেগুলি বক্রলিপিতে নির্দিষ্ট করে দিলাম।

বঙ্কিমচন্দ্র রাজকৃষ্ণের প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাসকে সুবর্ণমুষ্টি ও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ সামাজিক ইতিহাস বলে বর্ণনা করেছিলেন। এই উক্তি রমেশচন্দ্রের বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে আরও বহুগুণে সত্য। বস্তুতঃ ইতিপূর্বে বাংলার ইতিহাস এমন সুসম্পূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে কল্পিত বা রচিত হয়নি। প্রায় এক শো বছরের বাংলার ইতিহাসচর্চার সুপরিণত রূপ হচ্ছে ওই

ক্ষুদ্র পুস্তকখানি। ওই গ্রন্থপ্রকাশের পর বিগত ষাট বছরের মধ্যে বাংলার ইতিহাসের জ্ঞান বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই দীর্ঘকালের মধ্যে প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য অনুরূপ আর-একখানি বই প্রকাশিত হল না। অধিকন্তু এই সময়ের মধ্যে আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে বাংলার ইতিহাস পড়াবার ব্যবস্থাই লুপ্ত হয়ে গেছে।

রমেশচন্দ্রের বইটি সম্বন্ধে একটিমাত্র অভিযোগ এই যে, বইটি ইংরেজিতে লেখা। বাংলায় লেখা হলে তার সুপ্রভাব গভীরতর ও ব্যাপকতর হতে পারত। অবশ্য ইংরেজিতে লেখার অপরাধ তাঁর নয়, সে অপরাধ তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার। শিক্ষার ভাষা সম্বন্ধে ১৮৯৩ সালে 'ইংরেজি সাহিত্যে কৃতবিদ্য' লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় যে প্রবন্ধ লেখেন তার থেকে একটি অংশ এখানে উদ্‌ধৃত করি।—

যদি বাঙ্গালায় শিক্ষা দেওয়াই স্থির হয় তবে অতিশীঘ্রই সকল বিষয়েই বাঙ্গালায় শিক্ষাপুস্তক বাহির হইবে। লিখিবার লোক যে নাই তা নয়। বরং এক আশ্চর্য দেখা যায় যে, বাঙ্গালীতে বাঙ্গালী ছেলেদের জন্য বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতেছেন, কিন্তু ইংরাজী ভাষায়! যদি বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাস পড়াইবার প্রণালী প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কি রমেশচন্দ্র মহাশয় তাঁহার রচিত বাঙ্গালার ও ভারতবর্ষের ইতিহাস বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতেন না?

—সাধনা, ১২৯৯ মাঘ, পৃ ১৯৭

যখন বাংলার অতীত ইতিহাসের বহিরাকৃতিও স্পষ্ট হয়নি, তখনও আমাদের বিদ্যালয়ে বাংলার ইতিহাস অপাংক্তেয় বলে স্বীকৃত হত, অথচ আজ যখন সে ইতিহাস প্রায় পূর্ণাবয়ব নিয়েই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখন ওই শিক্ষামন্দিরে তার কোনো স্থান নেই ; অচিরে সে স্থানলাভের কোনো লক্ষণও দেখছি না। কিন্তু একথাও সত্য যে, শিক্ষার্থি- ও শিক্ষক-সমাজে বাংলার ইতিহাসকে যথাযোগ্যভাবে স্বীকার করে না নেওয়া হলে বাঙালির সংস্কৃতিকে অচিরে পূর্ণতাদানের আশা বৃথা।

১২

লোকশিক্ষায় বাংলার ইতিহাস

এই প্রসঙ্গে দেশের মনস্বী ইতিবৃত্তকারদের একটা কর্তব্যের কথাও বলা প্রয়োজন। এক যুগে শিক্ষার উচ্চতর বিভাগে বাংলা সাহিত্য পঠন-পাঠনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু সাহিত্যিকদের অবিরাম সাধনার ফলে বাংলা সাহিত্যের শক্তি ও সমৃদ্ধি যখন উপেক্ষণীয়তার সীমা অতিক্রম করে গেল তখন শিক্ষামন্দিরের দ্বারও তার প্রতি স্বাগতসম্ভাষণ নিয়েই উন্মুক্ত হয়ে গেল। আমাদের ইতিহাস-সাহিত্যও যেদিন যথেষ্ট শক্তি ও সমৃদ্ধির অধিকারী হবে তখন তার জন্যও শিক্ষাবিভাগের দ্বার উদ্‌ঘাটিত না হয়ে পারবে না। দেশের মধ্যে বাংলা দেশের ঐতিহাসিক জ্ঞানকে পরিব্যাপ্ত করে দেবার দায়িত্ব যুগপৎ শিক্ষাবিভাগের এবং পুরাবৃত্তকারদের। যদি দুই পক্ষই

একসঙ্গে তৎপর হন তবে তার চেয়ে সুখের বিষয় আর নেই। কিন্তু এক পক্ষ নিষ্ক্রিয় থাকলে অপর পক্ষের অধিকতর সক্রিয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমান ক্ষেত্রে শিক্ষাবিভাগে এ-বিষয়ে সচেতনতার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং বাংলা ইতিহাস-সাহিত্যে সমৃদ্ধি ও শক্তি সঞ্চারের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে ইতিবৃত্তসাধকদেরই। শুধু বাংলা ইতিহাস-সাহিত্যকে পুষ্ট করে তোলাই যথেষ্ট নয়; তার দ্বারা যে পরিমাণে ঐতিহাসিক জ্ঞান-ভাণ্ডারের সঞ্চয়বৃদ্ধি ঘটবে সে পরিমাণে দেশের লোকের মনে তার বিকিরণ ঘটবে না। দেশের সাহিত্যে জ্ঞানকে পুঞ্জীভূত করে তোলাই একমাত্র কর্তব্য নয়, সে জ্ঞানকে অবিশেষজ্ঞ লোক-সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়াও চাই। বিদেশে দেখি বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের মহারথীরাই লোকশিক্ষার দায়িত্বও নিজেরাই গ্রহণ করে থাকেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জেম্‌স্‌ জীন্‌সএর **The Mysterious Universe** নামক বইটির উল্লেখ করতে পারি। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে এজাতীয় কত যে বই নিত্য প্রকাশিত হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। পাশ্চাত্ত্য জগতে জ্ঞানবিজ্ঞানকে লোকশিক্ষার কাজে লাগাবার ব্যাপক প্রয়াসের তুলনায় এ-বিষয়ে আমাদের ঔদাসীন্য সত্যই লজ্জাকর; আর এই ঔদাসীন্য যে আমাদের জাতীয় অগ্রগতির একটি প্রধান অন্তরায় তাতেও সন্দেহ নেই। অথচ আমাদের দেশের যাঁরা মনীষী তাঁরা যে এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ছিলেন তা বলা যায় না।

রামমোহন রায় বাংলা ভাষাকে সহজে অধিগম্য করবার জন্যে গৌড়ীয় ব্যাকরণ লিখেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণ-পরিচয়, বোধোদয়, কথামালা, উপক্রমণিকা, ব্যাকরণকৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থ স্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রও শিক্ষাবিস্তারের সাহায্যার্থ সহজ রচনা-শিক্ষা, সহজ ইংরেজী শিক্ষা লিখতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। এই লোকশিক্ষাব্রতীদের মধ্যে বোধ করি রবীন্দ্রনাথের স্থানই সর্বোচ্চ। তাঁর সংস্কৃতশিক্ষা, ইংরাজি সোপান, সহজ পাঠ, বিশ্বপরিচয় প্রভৃতি অনেকগুলি পুস্তকের নাম স্মরণ করলেই এ-কথার যাথার্থ্য বোঝা যাবে। তদুপরি তাঁর প্রবর্তিত বা সংকল্পিত লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা এবং বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার কথাও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু ইতিহাসের, বিশেষতঃ বাংলার ইতিহাসের, জ্ঞানকে জনসাধারণের মনে ছড়িয়ে দেবার কোনো উল্লেখযোগ্য প্রয়াস আজ পর্যন্ত হয়নি বললে অন্যায় হবে না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামগতি ন্যায়রত্ন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতির বাংলার ইতিহাস বিদ্যালয়-নিরপেক্ষ লোকশিক্ষাবিস্তারের অভিপ্রায়ে রচিত নয়। অক্ষয়কুমারের সিরাজদ্দৌলা, কালী-প্রসন্নের নবাবী আমল, রাখালদাসের বাংলার ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থের দ্বারা বাংলা ইতিহাস-সাহিত্যের পুষ্টি হয়েছে, প্রত্যক্ষতঃ লোকশিক্ষার সহায়তা হয়নি। এই ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্রের বাংলা-দেশের ইতিহাস পথপ্রদর্শকের ম[illegible] অধিকারী। এই দিকে দেশের ইতিবৃত্তকারদের অবিলম্বে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। বঙ্গীয় ইতিহাস-পরিষদ্ যদি একটি ইতিহাস-

গ্রন্থমালা প্রকাশে ব্রতী হন তাহলেই এই পরিষদ্-প্রতিষ্ঠার একটি প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদ্ কিন্তু ইতিমধ্যেই অনুরূপ গ্রন্থমালা প্রকাশে অনেকটা অগ্রসর হয়েছেন। উক্ত ইতিহাস-গ্রন্থমালার প্রথম তিনটি বই হবে বাংলার আদি, মধ্য ও বর্তমান যুগের সংক্ষিপ্ত ও সরল ইতিহাস। কিন্তু ব্যক্তিগত-ভাবেও প্রত্যেক ঐতিহাসিকের স্বতন্ত্র কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে। তাঁরা দেশের লোকশিক্ষাকে উপেক্ষা করে নিশ্চয়ই জাতির শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অর্জনের আশা করতে পারেন না। এই লোকশিক্ষার ব্যাপারে প্রাচীন বাংলার লোকপুরাবৃত্ত-রচয়িতা নীহাররঞ্জনের দায়িত্ব একটি বিশেষ পর্যায়ভুক্ত। তিনি যদি রমেশচন্দ্রের অনুবর্তন করে বাংলার লোকশিক্ষার কাজে ব্রতী হন এবং রাখালদাসের বাংলার ইতিহাসের আয়তনে অনধিক পাঁচ শো পৃষ্ঠার মধ্যে সাধারণের অধিগম্য সরল ভাষায় একখানি সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালীর ইতিহাস প্রণয়ন করেন তা হলেই তাঁর ইতিহাস-সাধনা যথার্থ সিদ্ধিলাভ করবে। তাঁর বৃহৎ কীর্তির চেয়েও মহৎ হবে এই ক্ষুদ্র কাজটি।[১]

লোকব্যবহারে না লাগানো পর্যন্ত জ্ঞানসাধকের সাধনা কখনও অবন্ধ্যতা লাভ করতে পারে না এবং লোকঋণ পরিশোধ না করা

১ সুখের বিষয় সম্প্রতি (১৯৫২) বাঙ্গালীর ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত কিশোর সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সংক্ষেপ করেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বইটির বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, "মূল গ্রন্থটির ভাব ও বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখে সংক্ষেপে সহজ ভাষায় লেখা হওয়ায় বাংলা সাহিত্যের একটি বড় অভাব মিটবে। আত্মবিস্মৃত বাঙালি জাতির কাছে এই বই হবে নবজাগরণের শঙ্খধ্বনি।" আশা করা যায় এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণের দ্বারা বাংলার ইতিহাসের জ্ঞান বিস্তারের সহায়তা হবে।

পর্যন্ত লোকস্মৃতিতে প্রতিষ্ঠা অর্জনের অধিকারীও হওয়া যায় না, একথা আজ আমাদের ঐতিহাসিক-সমাজের স্মরণ করবার সময় এসেছে।

১৩

পরিশেষ

বর্তমান নিবন্ধের প্রথমেই বলেছি, ইতিহাসহীনতাই ভারতীয় সাহিত্যের সব চেয়ে বড় কলঙ্ক এবং ইতিহাস-চেতনার অভাবই ভারতীয় মনের সব চেয়ে বড় দুর্বলতা। এই দুর্বলতাই ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের তথা তার সংস্কৃতির বহু শতাব্দীব্যাপী অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ। পৃথিবীর সব সভ্য দেশেরই ইতিহাস আছে, নেই কেবল ভারতবর্ষের। আরব ইরান তুরকি চীন জাপানের সাহিত্যে ইতিহাসের প্রাচুর্য যেমন বিস্ময়কর, ভারতবর্ষের সংস্কৃত পালি প্রাকৃত প্রভৃতি সাহিত্যের ইতিহাস-বিভাগের রিক্ততাও তেমনি বিস্ময়কর। ভারতীয় চিত্ত নিজের এই দুর্বলতার কথা কখনও আবিষ্কার করতে পারেনি। অথচ বিদেশীয়দের চোখে ভারতবর্ষের ইতিহাসহীনতা নিমেষেই ধরা পড়েছে। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে তুরকি মনস্বী আবুরীহান অলবেরুনী (৯৭৩-১০৪৮) ভারতীয় মনের এই দৈন্যের কথা অতি তীক্ষ্ণ ভাষায় ব্যক্ত করে গেছেন। তাঁর উক্তি এই—

Unfortunately the Hindus do not pay much attention to the historical order of things, they are very careless in relating the chronological succession of their kings, and

when they are pressed for information and are at a loss, not knowing what to say, they invariably take to tale-telling.

—**Alberuni's India (Sachau),** অধ্যায় ৪৯

অতঃপর মধ্যযুগে বহু শতাব্দী ধরে আরব তুরকি পাঠানেরা ভারতবর্ষে বসেই অজস্র ধারায় ইতিহাস রচনা করলেন। তবু ভারতবর্ষ এদিকে সজাগ হল না, নিজেদের ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তা বিশাল ভারতবর্ষের কোথাও কিছুমাত্র অনুভূত হল না। রাজপুত মারাঠা ও শিখদের যেটুকু ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে আমাদের এই চিরন্তন পুঞ্জীভূত কলঙ্ক অপনীত হয় না। আধুনিক যুগে পাশ্চাত্ত্য মনস্বীরাও বিপুল ও সমৃদ্ধ ভারতীয় সাহিত্যের এই অভাব দেখে বিস্মিত না হয়ে পারেননি। তারপর দীর্ঘকাল ধরে তাঁরাই আমাদের ইতিহাস উদ্ধারে ব্রতী হন। অবশেষে তাঁদের প্রেরণায় ও অন্যান্য নানা কারণে জাতীয় জাগরণের ফলে এ বিষয়ে আমাদের চেতনা-সঞ্চার হয়। উনবিংশ শতকের শেষপাদেই ভারতীয় চিত্তে ইতিহাসচেতনার প্রথম লক্ষণ দেখা দেয়। কিন্তু ওই চেতনার সক্রিয় আবির্ভাবের যুগ হচ্ছে বিংশ শতক। বিগত অর্ধশতাব্দী কালের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রায় সর্বপ্রান্তেই জাতীয় ইতিহাস উদ্ধারের যে উদ্যম জেগে উঠেছে তা উপেক্ষণীয় নয়। উনবিংশ শতকের একেবারে শেষ বৎসরে (১৯০০) ম্যাকডোনেল সাহেব ভারতীয় মনে ইতিহাসচেতনার যে ঐকান্তিক

অভাবের (total lack of the historical sense) কথা বলেছিলেন তা শুধু প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নয়, ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির সর্ব যুগ ও সর্ব বিভাগের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। বিশেষ সুখের বিষয় এই যে, বিংশ শতকের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ওই উক্তির প্রযোজ্যতা অনেকাংশেই বিলুপ্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের আবহমানকালীন ইতিহাসহীনতা যেমন এক সময়ে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের দৃষ্টি এড়ায়নি, আধুনিক ভারতের ইতিহাসতৃষ্ণাও তেমনি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাই ম্যাকডোনেল-কথিত 'total lack of the historical sense'-এর ঠিক বিপরীত মন্তব্যই আজকাল তাঁদের কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে। ইদানীং কালে (১৯৪৯) বিখ্যাত ভারততাত্ত্বিক বার্নেট সাহেব কোনো প্রসঙ্গে বলেছেন, "One of the most hopeful features in the mental life of modern India is its thirst for history"। এই যে ইতিহাস-পিপাসা, আশা করা যায় তার প্রভাবে ভারতীয় মন অচিরকালের মধ্যেই ইতিহাসপুষ্ট ইউরোপীয় মনের সমকক্ষতা অর্জন করবে এবং ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বাংশেই নূতন জীবনস্পন্দন অনুভূত হবে।

একথা সত্য যে, ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশেই এই ইতিহাসচেতনা জাগ্রত ও উদ্ভূত হয়েছে সকলের আগে এবং সব চেয়ে-বেশি, আর তাতে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধনেও কম সহায়তা হয়নি। কিন্তু একথাও সত্য যে, এই ইতিহাস-

চেতনা আমাদের জীবনে এখনও সর্বতোভাবে সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি। এখনও ইতিহাসবোধকে আমাদের মনোজীবনের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ বলে স্বীকার করা যায় না; আমাদের মননধারা এখনও ইতিহাসবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না, ফলে আমাদের সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে ঐতিহাসিক চেতনা ও জ্ঞানের প্রভাব যথোচিতভাবে সঞ্চারিত হতে পারেনি। কথা- ও কাব্য-সাহিত্যে বাঙালির যতখানি আত্মোপলব্ধি ঘটেছে, ইতিহাস-সাহিত্যেও ততখানি আত্মোপলব্ধি চাই। সাহিত্যের ন্যায় বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞানশাস্ত্রই যখন আমাদের মনোজীবন গঠনে ও নিয়ন্ত্রণে যথাযোগ্যভাবে কাজে লাগবে তখনই আমাদের জাতীয় জীবনের অপূর্ণতা ও অপুষ্টতার অবসান ঘটবে। এ সমস্ত জ্ঞানশাস্ত্রের মধ্যে ইতিহাস-বিভাগে বাঙালি যতখানি সিদ্ধিলাভ করেছে তা অপ্রশংসনীয় নয়, কিন্তু সে সিদ্ধি একান্তই আংশিক। ইতিহাসচেতনা ও ইতিহাসের জ্ঞানকে আমাদের মননক্রিয়া, সাহিত্যরচনা তথা জীবননির্বাহের ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে না পারা পর্যন্ত আমাদের ইতিবৃত্ত-সাধনা সার্থক হবে না। তবে আমাদের ইতিহাসব্রতীদের মধ্যে অনলস উদ্যম ও পাঠকসমাজের মধ্যে উৎসুক আগ্রহের লক্ষণ যে-ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে, তাতে আশা করা যায় ওই সার্থকতালাভের দিন আর বহু দূরবর্তী নয়।

অনুষঙ্গ

১ আধুনিক যুগের প্রথম থেকে উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে যে-সমস্ত পুস্তক ও তথ্যের বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে, তার একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিলাম। যে যে পৃষ্ঠায় এই বিষয়গুলির আলোচনা আছে তাও সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ করা গেল। গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত হয়নি এমন অনেকগুলি বিষয়ও এই তালিকায় স্থান পেল এবং প্রয়োজন মতো সংক্ষেপে আলোচিত হল। বিংশ শতকের গ্রন্থাদির বিষয় অষ্টম ও নবম পরিচ্ছেদে কালানুক্রমেই আলোচিত হয়েছে।

১৭৬৩-৬৪ ॥ তারিখ-ই-বঙ্গাল : সলিমুল্লা। বাংলার তৎকালীন গবর্ণর হেনরি ভ্যান্‌সিটার্টের নির্দেশে সংকলিত। এক হিসাবে আধুনিক যুগে বাংলার ইতিহাস সংকলনের এটাই প্রথম প্রয়াস। পৃ ৬০

১৭৭৮ ॥ হালহেডের বাংলা ব্যাকরণে উইলকিন্‌স্‌-উদ্‌ভাবিত বাংলা টাইপের প্রথম প্রয়োগ। পৃ ২৬

১৭৮০ ॥ সার চার্লস্‌ উইলকিন্‌সের বাদাল গরুড়স্তম্ভলিপি প্রাপ্তি। পৃ ২৬

১৭৮৪ ॥ কলকাতায় এশিআটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল প্রতিষ্ঠা। পৃ ২৪

১৭৮৮ ॥ ১. এশিআটিক সোসাইটির পত্রিকার প্রথম খণ্ডে বাদাল গরুড়স্তম্ভলিপির ইংরেজি মর্মানুবাদ প্রকাশ। পৃ ২৬

২. George Udnyর নির্দেশে তাঁর ডাকমুনসী গোলাম হোসেন সলীম-সংকলিত 'রিয়াজ-উস-সলাতীন' গ্রন্থ প্রকাশ। পৃ৬০

৩. সলিমুল্লা-প্রণীত 'তারিখ-ই-বঙ্গাল' পুস্তকের Gladwin-কৃত ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ। পৃ ৬০

৪. গোলাম হুসেন তবাতবাই-প্রণীত 'সিয়র-উল-মুতাখরিন'। বাংলার নবাবী আমলের প্রামাণিক ইতিহাস হিসাবে এই বই-খানির গুরুত্ব সুবিদিত, গ্রন্থোক্ত অধিকাংশ ঘটনাই গ্রন্থকারের জ্ঞানগোচর ছিল। পৃ ১৬৩

১৭৯৮॥ এশিআটিক রিসার্চেজ পত্রিকায় প্রকাশিত Enumeration of Indian Classes প্রবন্ধে এইচ. টি. কোলব্রুক-কর্তৃক বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনার সূত্রপাত। পৃ ২৭, ১৫৮

১৮০৭॥ এশিআটিক রিসার্চেজ পত্রিকায় কোলব্রুক-কর্তৃক রণবঙ্কমল্লদেবের ময়নামতী-লিপি এবং তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের আমগাছি-লিপি মূল সংস্কৃত পাঠ ও ইংরেজি অনুবাদ সহ প্রকাশ। তাম্রশাসনাদি প্রাচীন লিপির সাহায্যে বাংলার ইতিহাস উদ্ধারের এই প্রথম প্রচেষ্টা। পৃ ২৭

১৮১৩॥ Charles Stewart-প্রণীত "The History of Bengal *from the first Mohammedan invasion until the virtual conquest of that country by the English, A. D. 1757*" গ্রন্থ প্রকাশ। আধুনিক পদ্ধতিতে রচিত প্রথম বাংলার ইতিহাস। বাংলাদেশের কোনো "account of the state of the civilization or of the

progress of the arts and sciences" দেওয়া সম্ভব হয়নি বলে গ্রন্থকার দুঃখ প্রকাশ করেছেন পুস্তকের ভূমিকায়। আজ প্রায় দেড় শো বছর পরেও এই অভাব অপূর্ণই রয়ে গেছে বলা যায়। রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের বিবরণেও ভুলচুক থেকে যেতে পারে বলে গ্রন্থকার নিজেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। সে-সব ভুলচুক আধুনিক কালে বহুল পরিমাণেই সংশোধিত হয়েছে। পৃ ২৫

১৮১৭ ॥ 'রিয়াজ-উস-সলাতীন' গ্রন্থের প্রণেতা গোলাম হুসেন সলীমের মৃত্যু।

১৮৩৯ ॥ **John Clark Marshman**-প্রণীত **Outline of the History of Bengal**। ভূমিকার তারিখ ১৮৩৮, ডিসেম্বর ২৭। পৃ ১৬১

১৮৪০ ॥ বাঙ্গালার ইতিহাস : গোবিন্দচন্দ্র সেন। এখানিই বাঙালির তথা বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম[১] বাংলার ইতিহাস। পৃ ১৬৫

১৮ (?)—বঙ্গদেশ পুরাবৃত্ত : **Wenger**। স্কুলবুক সোসাইটি-কর্তৃক প্রকাশিত। পৃ ১৬৪

১৮৪৪ ॥ **History of Bengal** : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় সর্বোচ্চ দুই শ্রেণীতে পাঠ্য। পৃ ১৬৭

১৮৪৭ ॥ **Stewart's History of Bengal** : সরকারি

১ দ্রষ্টব্য সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ড (১৩৪৮) পৃ ১৭১। সুকুমার সেন বলেন রামকমল সেনের 'বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত' প্রকাশিত হয় ১৮৩৪ সালে (বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ ৫৫)।

স্কুল-কলেজের পাঠ্য। তৎকালীন Council of Education-এর সেক্রেটারি F. J. Mouat এই নূতন সংস্করণের বইএর গোড়াতেই যে বিজ্ঞাপন (তারিখ ১৮৪৭ জুন ২৭) প্রকাশ করেন, তা উদ্‌ধৃত করছি।—

The present edition of Stewart's History of Bengal, has been published under the immediate superintendence and sanction of the Council of Education, for the use of the Government Colleges and Schools in Bengal. The former edition was an expensive quarto work, out of print and inaccessible.

এই সরকারি শিক্ষা-সংস্করণের গ্রন্থ অবলম্বনেই পরবর্তী কালের বঙ্গবাসী সংস্করণ (১৯০৪) প্রকাশিত হয়। দেখা যাচ্ছে এই সময়ে মার্শম্যান ও স্টুআর্ট দুজনের বাংলার ইতিহাসই বিদ্যালয়গুলিতে সুপ্রচলিত ছিল। পৃ ২৫, ৫৮

১৮৪৮ ॥ বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মার্শম্যানের বইএর শেষ অংশের অনুবাদ। পৃ ১৬৬

১৮৪৯ ॥ বঙ্গেতিহাস : হুগলি-কলেজের স্কুলবিভাগে বঙ্কিম-চন্দ্রের পাঠ্য। রচয়িতা অজ্ঞাত। পৃ ৩২, ১৬৭

১৮৫৯ ॥ বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ : রামগতি ন্যায়রত্ন। মার্শম্যানের পুস্তকের প্রথমাংশের অনুবাদ। পৃ ১৬৮

১৮৬৫-৬৯ ॥ বাঙ্গালার ইতিহাস, তৃতীয় ভাগ : ভূদেব মুখোপাধ্যায়। বেন্টিঙ্কের পর থেকে বীডনের শাসনকাল পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস। স্বাধীনভাবে সংকলিত এবং শিক্ষাদর্পণ ও

এডুকেশন গেজেটে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯০৩ সালে। পৃ ৫২, ১৬৯

১৮৬৯ ॥ কবিচরিত : হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। হরিমোহনকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুবর্তী বলা যায়। ঈশ্বরগুপ্তের সংবাদপ্রভাকরে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদপ্রমুখ কবিদের জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। 'কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ সালে। পৃ ৪২

১৮৭১ ॥ ১. **Bengali Literature :** বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের কবিচরিতের আলোচনা উপলক্ষ্যে রচিত এই ইংরেজি প্রবন্ধটি ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় বেনামে প্রকাশিত হয়। সমালোচনা উপলক্ষ্যে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধমাত্র হলেও বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা হিসাবে এই রচনাটি আজও নিষ্প্রভ হয়ে যায়নি ; আজও তা পাঠকের মনে গভীর চিন্তার উদ্রেক করে। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের **A Popular Literature for Bengal** প্রবন্ধটিও (১৮৭০ সালে বেঙ্গল সোশ্যাল সায়ান্স এসোসিয়েশনের সভায় পঠিত) উল্লেখ্য। এটিতেও বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক প্রকৃতি ব্যাখ্যাত হয়েছে। দুটি প্রবন্ধই শতবার্ষিক সংস্করণ বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর ইংরেজি-খণ্ডে প্রাপ্তব্য। পৃ ৪২

২. বঙ্গভাষার ইতিহাস : মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃ ৪২

১৮৭২ ॥ বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব, প্রথম ভাগ : রামগতি ন্যায়রত্ন। পৃ ৪২

১৮৭৩ ॥ ১. রামগতি ন্যায়রত্ন-প্রণীত উক্ত গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের একত্র প্রকাশ (১২৮০ আষাঢ়)। পৃ ৪২

২. বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার' প্রবন্ধ প্রকাশ (১২৮০ ভাদ্র)। বাংলার ইতিহাস-উদ্ধারে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্রতগ্রহণের এটাই প্রথম নিদর্শন। অতঃপর তিনি এ সম্বন্ধে আরও অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (দ্রষ্টব্য পৃ ২৯)। বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর আগ্রহের প্রথম পরিচয় পাই তাঁর 'মৃণালিনী' উপন্যাসে (১৮৬৯); এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে গৌড়েশ্বরের সভা বর্ণনা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

৩. H. Blochmann-রচিত Contributions to the Geography and History of Bengal: Mahommedan Period 1203-1538। এই রচনাটির মূল্য সুজ্ঞাত। বিশেষ পরিচয় অনাবশ্যক।

১৮৭৪ ॥ ১. The Peasantry of Bengal: রমেশচন্দ্র দত্ত। পৃ ১৭৭

২. Roper Lethbridge-কৃত An Easy Introduction to the History and Geography of Bengal for Junior Classes in Schools। ভূমিকার তারিখ ১ জুলাই ১৮৭৪। পৃ ১৭৩

৩. Bengal: শশীচন্দ্র দত্ত। রমেশচন্দ্র দত্তের খুল্লতাত শশীচন্দ্রও ঐতিহাসিক তথা সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি

অর্জন করেছিলেন। দ্রষ্টব্য J. N. Gupta-প্রণীত *Life and Work of Romesh Chunder Dutt*, 1911, পৃ ৭। শশীচন্দ্রের *Ancient World, Modern World* ও *Bengal* এই তিনখানি ইতিহাসগ্রন্থই এক সময়ে খ্যাতি অর্জন করেছিল। এই তিনখানি বই-ই প্রথমে J. A. G. Barton এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ সালে *Bengal* বইখানি গ্রন্থকারের স্বনামে পুনঃপ্রকাশিত হয়। এই অনতিক্ষুদ্র বইখানি (২৫০ পৃষ্ঠা) তৎকালে একখানি পূর্ণাঙ্গ বাংলার ইতিহাসের অভাব বহুল পরিমাণে পূরণ করেছিল। আখ্যাপত্রেই বইটির পরিচয় দেওয়া আছে: An account of the country from the earliest times। বইটির মোট দশ অধ্যায়ের বিষয়সূচী এই: ১। Physical peculiarities ২। Products: Cultivated and Natural ৩। Traditions of the Hindu Period ৪। Reminiscences of the Mahommedan Era ৫। Antiquarian Relics ৬। Classification and Distribution of the People ৭। Condition and Distinctive Traits of the People ৮। Religious Beliefs and Festivals ৯। British Rule: Its Effect ১০। Progress and Education। এর থেকেই বইখানির স্বরূপ বোঝা যায়; বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার আদর্শেই তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এই হিসাবেও তিনি যথার্থতঃই ভ্রাতুষ্পুত্র রমেশচন্দ্রের অগ্রগামী ছিলেন।

৪. রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-কৃত 'প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' (২৮ ডিসেম্বর ১৮৭৪)। বঙ্কিমকৃত সমালোচনা: বঙ্গদর্শন, ১২৮১ মাঘ। পৃ ২২-২৩

১৮৭৫ ॥ লালমোহন বিদ্যানিধি-প্রণীত 'সম্বন্ধনির্ণয়' বা **A Social History of the Principal Hindu Castes in Bengal**। বঙ্কিমকৃত সমালোচনা: বঙ্গদর্শন, ১২৮২ অগ্রহায়ণ। এ স্থানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, কোলব্রুক-রচিত বাংলার সামাজিক ইতিহাস-বিষয়ক প্রবন্ধটি মাত্র দুই বৎসর পূর্বে ১৮৭৩ সালে গ্রন্থাকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়। দ্রষ্টব্য **Miscellaneous Essays by H. T. Colebrooke, A New Edition with Notes by E. B. Cowell,** পৃ ১৫৭-৭০। পৃ ১৫৫-৫৭

১৮৭৬ ॥ বাঙ্গালার ভূগোল ও ইতিহাস: ই. লেথব্রিজ।

পূর্বোক্ত লেথব্রিজ-কৃত ইংরেজি বইখানির (১৮৭৪) বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ কে করেছিলেন জানা নেই। পরিচয়পত্রে শুধু বলা হয়েছে "কৃষ্ণনগর কলেজাধ্যক্ষ ই. লেথব্রিজ এম-এ মহোদয়ের আদেশানুসারে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত"। আরও আছে 'বিদ্যালয়-ব্যবহার্য পুস্তক'। বোঝা যাচ্ছে তখনকার দিনে ইংরেজি ও বাংলা উভয় প্রকার বিদ্যালয়েরই নিম্নশ্রেণীতে বাংলার ইতিহাস অবশ্যপাঠ্য ছিল। ৯ অধ্যায় এবং ১১৯ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্রায়তন বইখানি তখনকার দিনে বাংলার ছাত্রসমাজের উপরে কম প্রভাব বিস্তার করেনি।

এই পুস্তকে বাংলার ইতিহাস ১৮৫৪ সালে লেফটেনেণ্ট

গবর্ণরগণদের সৃষ্টি পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। উপসংহারে পরবর্তী ঘটনা ১৮৭৪ সালে সার রিচার্ড টেম্প্‌ল্‌এর নিয়োগ পর্যন্ত সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের গ্রন্থাগারে এই বইএর এক কপি আছে।

১৮৭৭ ॥ **The Literature of Bengal**: রমেশচন্দ্র দত্ত। রমেশচন্দ্র বহুল পরিমাণেই তাঁর খুল্লতাত এবং Bengal গ্রন্থের প্রণেতা শশীচন্দ্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তারই নিদর্শনস্বরূপ তিনি এই গ্রন্থখানি খুল্লতাতকে উৎসর্গ করেন। খুল্লতাতের মতোই তিনিও এই গ্রন্থখানি প্রথমে ছদ্মনামে প্রকাশ করেন। পৃ ৪২-৪৩

১৮৭৮ ॥ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা: রাজনারায়ণ বসু। এই গ্রন্থে রাজনারায়ণের বিশিষ্ট চিন্তাধারার সুস্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। পৃ ৪২

১৮৮০ ॥ ১. **The Hindu Bengal**: প্যারীচাঁদ মিত্র। 'আলালের ঘরের দুলাল'- রচয়িতা টেকচাঁদ ঠাকুর নামে সুপরিচিত প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। দেশের প্রাচীন ইতিহাসের প্রতিও তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তারই অন্যতম নিদর্শনস্বরূপ এই প্রবন্ধটি ক্যালকাটা রিভিউ পত্রে প্রকাশিত হয় (১৮৮০ এপ্রিল)। এটি সম্ভবতঃ পরে পুস্তিকা আকারেও প্রকাশিত হয়েছিল। কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরির গ্রন্থতালিকায় এটির উল্লেখ আছে।

২. বাংলার ইতিহাস উদ্ধারের জন্য বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের আহ্বান।—"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি" (১২৮৭ অগ্রহায়ণ)। এই সময় থেকেই বাংলার ইতিহাস সন্ধানে নবচেতনা ও নবযুগের আরম্ভ। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও নবোদ্যমে বাংলার ইতিহাসসন্ধানে ব্রতী হন। প্রমাণ তাঁর 'বাঙ্গালির উৎপত্তি' নামক প্রবন্ধাবলী (বঙ্গদর্শন, ১২৮৭ পৌষ-১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ)। পৃ ২১, ২৯

১৮৮৬॥ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-কৃত 'প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৭৪) পুস্তকের চতুস্ত্রিংশ সংস্করণ। চৌদ্দ বছরে চৌত্রিশ সংস্করণ প্রকাশের তাৎপর্য চিন্তনীয়। পৃ ১৭০

১৮৮৯॥ **General Sketch of Bengal**: সূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায়। লেখক ছিলেন সিটি কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক। এই ক্ষুদ্র বইখানি (৮৯ পৃষ্ঠা) স্কুলের ছোট ছাত্রদের জন্য অভিপ্রেত। ভূমিকায় আছে,—**This little book has been written with a view to give the young pupils of our schools a general knowledge of the History of Bengal from the earliest times to the present day**। তৎকালে আমাদের ইস্কুলগুলিতে বাংলার ইতিহাস পড়াবার রীতি কিরূপ ছিল, শুধু এটুকু দেখাবার জন্যই এই নগণ্য বইটির নাম উল্লেখ করা গেল।

নতুবা মার্শম্যান, লেথব্রিজ বা রমেশচন্দ্রের বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে উল্লিখিত হবার যোগ্যতা এই বইএর নেই।

১৮৯২ ॥ রমেশচন্দ্র দত্ত-প্রণীত **A Brief History of Ancient and Modern Bengal for the use of the Schools**। পৃ ১৭৭

১৮৯৪ ॥ ১. বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু (৮ এপ্রিল)।

২. বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ প্রতিষ্ঠা (২৯ এপ্রিল)। প্রথম সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত। পৃ ৪৩

১৮৯৫ ॥ **The Literature of Bengal** : রমেশচন্দ্র দত্ত ; পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। পৃ ৪৩

১৮৯৬ ॥ ১. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য : দীনেশচন্দ্র সেন। পৃ ৪৫

২. সম্বন্ধনির্ণয় : লালমোহন বিদ্যানিধি ; পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ। পৃ ১৫৭

১৮৯৭ ॥ সিরাজদ্দৌলা : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। পৃ ৩৪, ৪৬

১৮৯৯ ॥ ১. ঐতিহাসিক চিত্র : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। পৃ ৩৫, ৪৬

২. বাঙ্গালার ইতিহাস : রজনীকান্ত গুপ্ত। পৃ ৪৬

সংযোজন

বাংলাদেশের আধুনিক ইতিহাসের আকর বা উপাদান-সংকলন হিসাবে আরও কয়েকখানি বইএর নাম উল্লেখযোগ্য। বিনয় সরকারের নয়া বাঙলার গোড়াপত্তন দুই খণ্ড (১৯৩২),

বাড়তির পথে বাঙালী (১৯৩৪) এবং বিনয় সরকারের বৈঠকে বা বিংশ শতাব্দীর বঙ্গসংস্কৃতি প্রথম ভাগ (১৯৪২, দ্বিতীয় সং ১৯৪৪) ও দ্বিতীয় ভাগ (১৯৪৫), আধুনিক বাংলার ইতিহাস-লেখকের পক্ষে এগুলি বিশেষ মূল্যবান্ আকরগ্রন্থ। যোগেশচন্দ্র বাগলের মুক্তির সন্ধানে ভারত (১৯৪০, দ্বিতীয় সং ১৯৪৫), উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা (১৯৪১) এবং জাতিবৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ (১৯৪৬), এই বইগুলিতেও বাংলার ধর্ম- সংস্কৃতি-শিক্ষা- ও রাজনীতি-গত ইতিহাসের বহু মূল্যবান্ উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত উপকরণগ্রন্থসমূহের (পৃ ৯৩) সঙ্গে এই বইগুলিও অবশ্যস্মরণীয়।

অমিত সেন-প্রণীত **Notes on the Bengal Renaissance** (১৯৪৬) বইখানি ক্ষুদ্রায়তন (৬৬ পৃষ্ঠা মাত্র), কিন্তু এটির মূল্য সামান্য নয়। এটিতে ১৮১৪ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস অতি সংহত অথচ সুসংবদ্ধ ভাবে বিবৃত হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যেই লেখকের ঐতিহাসিক দৃষ্টির গভীরতা ও বিশিষ্টতা ফুটে উঠেছে। আধুনিক জগতের ইতিহাসে জাপান ও বাংলা এই দুটি প্রাচ্য দেশের উজ্জীবন দুটি বিস্ময়কর অধ্যায় রচনা করেছে। অথচ আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের এই নবযুগের ইতিহাস রচিত হল না, এটা বাংলার জাগরণব্যাপারটারই একটা দুর্বলতা। এই ত্রুটি মোচনে অনেকখানি সহায়তা করেছে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি। এমন সমগ্র দৃষ্টি নিয়ে লেখা বাংলার আধুনিক ইতিহাস আর

একখানিও বোধ করি নেই। শিবনাথ শাস্ত্রীর রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ এবং তার লেথব্রিজকৃত ইংরেজি সংস্করণের পাশেই এই পুস্তিকাটির স্থান।

লেখকের কাছে বাংলাদেশের দুটি দাবি আছে। এই খসড়াটুকুর মধ্যে তিনি যে বৃহত্তর পরিকল্পনার আভাসমাত্র দিয়েছেন, আধুনিক যুগের সেই পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখে তিনি বাংলার জাগরণকেই সম্পূর্ণ করে তুলুন। দ্বিতীয়তঃ, শুধু ইংরেজিতে নয়, এই ইতিহাসের বাংলা সংস্করণও চাই। আলোচ্যমান ক্ষুদ্রায়তন পুস্তকখানির যদি বাংলা অনুবাদ না হয়ে থাকে তবে অচিরাৎ তাও হওয়া উচিত।

গোধূলিধূসর আবরণে
অতীতের শূন্য তার সৃষ্টি মেলিতেছে মোর মনে।
এ শূন্য তো মরুমাত্র নয়,
এ যে চিত্তময়;
বর্তমান যেতে যেতে এই শূন্যে যায় ভ'রে রেখে
আপন অন্তর থেকে
অসংখ্য স্বপন;
অতীত এ শূন্য দিয়ে করিছে বপন
বস্তুহীন সৃষ্টি যত,
নিত্যকাল-মাঝে তারি ফলশস্য ফলিছে নিয়ত;
আলোড়িত এই শূন্য যুগে যুগে উঠিয়াছে জ্বলি,
ভরিয়াছে জ্যোতির অঞ্জলি।

—রবীন্দ্রনাথ

নির্দেশিকা

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৯, ৪৩, ৪৬, ৪৯, ৫৬, ৬২, ৬৪, ৬৮, ৭০, ১০৩, ১১০, ১২২, ১৩২, ১৩৩, ১৪৫, ১৭২, ১৮৪, ২০১

অন দি অরিজিন অব হিন্দু ফেসটিভল (বঙ্কিমচন্দ্র) ১৫৮

অন দি পাল এ্যাণ্ড সেন ডাইনাস্টিজ অব বেঙ্গল ৬৬, ৬৯

অন্নদাশঙ্কর রায় ৮৮, ৮৯, ১০০

অভ্র-আবীর ২১

অমিত সেন ২০২

অরিজিন এ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অব দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গোএজ ৮৭

অর্থশাস্ত্র ১১১, ১৩৯

অলবেরুনীজ ইণ্ডিআ ১৮৭

অশোকনাথ মুখোপাধ্যায় ১৫১

আউটলাইন অব হিস্টরি অব বেঙ্গল ১৬২, ১৯৩

আত্মচরিত (শিবনাথ শাস্ত্রী) ৫৬

আনন্দমঠ ৩১, ৩৩

আবদুস সালাম ৬০

আবুরীহান অলবেরুনী ১৮৬

আমগাছি-লিপি ২৭, ১৯২

'আমরা' ২০

আমাদের দেশাত্মবোধ ২০২

আর্কিওলজিক্যাল রিপোর্ট ৭৯

আরলি হিস্টরি অব কামরূপ ৭৬

আরলি হিস্টরি অব বেঙ্গল ৭১, ৭৩, ৭৪, ৮২, ৮৭, ১০৫, ১১৬

আর. সি. ডি (Ar Cy Dae) ৪৪

আলালের ঘরের দুলাল ১৯৯

আলিবর্দি ৫২

আশুতোষ ভট্টাচার্য ৮৪

'আহ্বান-গীত' ১৬

ইংরাজি-সোপান ১৮৪

ইজি ইনট্রোডাকশন টু দি হিস্টরি এ্যাণ্ড জিওগ্রাফি অব বেঙ্গল ১৭৫, ১৯৬

ইণ্ডিআ অব ঔরঙ্গজীব ৫২

ইণ্ডিআ আপিস লাইব্রেরি ১৭০

ইণ্ডিআন কালচার ১০৫

ইণ্ডিআন রিসার্চ ইনস্টিটিউট ১০৫

ইণ্ডিআন হিস্টরিক্যাল কোআর্টার্লি ১০৪

ইণ্ডো-এরিয়ান রেসেস ৭০

ইণ্ডো-এরিয়ানস্ ৬৯

ইতিহাস'(পত্রিকা) ৩৯, ১০২, ১০৫, ১৪৭, ১৬০

ইনস্ক্রিপসনস্ অব বেঙ্গল ৭৪, ৮২, ৯৪

ইস্ট ইণ্ডিআ কোম্পানি ৬০

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৪২, ৯২, ১৯৫
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮, ৩৩, ৫২, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৯, ১৭২, ১৮৪, ১৯৪

উইলকিনস, সার চার্লস ২৪, ২৬, ১০৯, ১১০, ১৫৪, ১৯১
উড্নি, জর্জ ৬০, ১৯২
উদয়নাচার্য ২২, ১৭৩
উপক্রমণিকা ১৮৪

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ২০২

এডুকেশন গেজেট ৫৩, ১৯৫
এনুমারেশন অব ইণ্ডিআন ক্লাসেজ ১৫৮, ১৯২
এন্সিএণ্ট ওআর্ল্ড ১৯৭
এপিগ্রাফিআ ইণ্ডিকা ৭৯
এলিঅট, হেনরি ১৭৬
এল্উইন, ডক্টর ভেরিঅর ৮৫
এল্ফিনস্টোন ১৮৭
এশিআটিক রিসার্চেজ ২৬, ২৭, ১৫৮, ১৯২
এশিআটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল ২৪, ২৬, ৬১, ৬৬, ৬৮, ১০৯, ১০৪, ১০৮, ১৯১

ঐতিহাসিক চিত্র ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪৬, ৫৬, ৫৭, ৬৩, ১০৩, ১৫৩, ১৭২, ২০১

ওএজার ১৬৪, ১৬৬, ১৯৩
ওএস্টম্যাকট, ই. ভি. ১৭৫, ১৭৬

কএনস এ্যাণ্ড ক্রনোলজি অব দি আরলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট স্লতানস অব বেঙ্গল ৭২
কথামালা ১৮৪
কনকলাল বড়ুয়া ৭৬
কন্ট্রিবিউসনস্ টু দি জিওগ্রাফি এ্যাণ্ড হিস্টরি অব বেঙ্গল ১৯৬
কপালকুণ্ডলা ৩৩
কবিচরিত্র ৪২, ১৯৫
কবিবর ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত ১৯৫
কমলাকান্ত ৩১
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১০৪
কাউএল, ই. বি. ১৯৮
কাউনসিল অব এডুকেশন ১৯৪
কাদম্বরীচিত্র ৪
কামরূপ-শাসনাবলী ৭৬
কার্জন ১০৪
কার্ল্ মার্ক্স্ ১৩৪
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪, ৪৭, ৪৯, ৫০, ৬২, ৭৩, ১২২, ১৮৪
কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৫৮, ১৫৯, ১৭৬
কুমুকভট্ট ১১১
কুহু ও কেকা ২০
কৃত্তিবাস ১৪০
কৃষ্ণনগর কলেজ ১৭৪, ১৭৫

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৫
কেম্ব্রিজ হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া ৯১, ১২১
কৈলাসচন্দ্র সিংহ ৩
কোলব্রুক, এইচ. টি. ২৪, ২৭, ১০৯, ১১০,
১৫৪, ১৫৫, ১৫৮, ১৯২, ১৯৮
কৌটিল্য ১১১
ক্যালকাটা রিভিউ ১৯৫, ১৯৯
ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি ৭০, ১০৪

'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি' ২১
গরুড়স্তম্ভ ২৬, ২৭, ১৯১
গান (দ্বিজেন্দ্রলাল) ২০
গিরীন্দ্রনাথ ১৬৮
গীতগোবিন্দ ১৭৩
গুরুগোবিন্দ ১১
গুর্‌লে, ডব্‌ল্‌-ইউ. আর. ৭১, ৭৭
গেইট, সার এডওআর্ড ৭৬
গোপাল ৬৬
গোবিন্দচন্দ্র সেন ১৬৫, ১৭২, ১৯৩
গোয়ালিয়র প্রশস্তি ১১৭
গোলাম হোসেন তবাতবাই ১৯২
গোলাম হোসেন সলীম ৬০-৬২, ১৯২-৯৩
গৌড় ২২
গৌড়রাজমালা ৬৭, ৬৮, ৬৯, ১২২, ১৩২,
১৩৩, ১৪৫
গৌড়লেখমালা ৬৮, ৭৪, ৭৬, ৮২, ৯৪, ১২২
গৌড়ের ইতিহাস ৬৫, ৭২

গ্ল্যাডউইন ৬০, ১৯২

ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য ৫৬

চন্দ্রশেখর ৬৩
চৈতন্য ১০, ২২, ১৭৩

জাতিবৈর ২০২
জাতিমালা ১৫৮
জাগ'ন ২০২
জোন্‌স, জেমস ১৮৩
জে. এন. গুপ্ত ১৯৭
জেনারেল স্কেচ অব বেঙ্গল ২০০
জে. সি. ঘোষ ৯৮
জোন্‌স্‌, সার উইলিঅম ২৪, ১০৯, ১১০, ১৫৫
জ্ঞানোপার্জিকা সভা ১৬৫

টমাস, ই. ১৭৬
টরেনবি ১৭৬
টেকচাঁদ ঠাকুর ১৯৯
টেম্পল, সার রিচার্ড ১৭৫, ১৯১

ডাইনাস্টিক হিস্টরি অব নর্দার্ন ইণ্ডিয়া ৭৫
ডাউসন ১৭৬
ডালহাউসি ১৭৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৯১, ৯৬, ১০০, ১০২, ১০৪
১১৪, ১১৮, ১২১

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ১৬৭, ১৯৩
তাম্রলিপি ২২
তারাচাঁদ চক্রবর্তী ১৬৫
তারিখ-ই-বঙ্গাল ৬০, ১৯১, ১৯২
ত্রিপুরার ইতিহাস ৩

দীনেশচন্দ্র সেন ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৬, ৫১, ৬৬, ৬৭, ৭১, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯২, ১১০, ১১৬, ১১৭, ১২২, ১৪০, ২০১
দুর্গেশনন্দিনী ৩৩
দেবী চৌধুরাণী ৩৩
দেবীবর ঘটক ৯
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২, ১৮, ১৬৭, ১৯৩
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ২০

ধর্মশাস্ত্র ১৩৯

নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ১৫৮
ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৮২
ননীগোপাল মজুমদার ৭৪
নবাবী আমল, বাঙ্গালার ইতিহাস ৩৪, ৪৭, ১৮৪
নয়া বাঙলার গোড়াপত্তন ২০১
নরেন্দ্রনাথ লাহা ১০৪
নলিনীকান্ত ভট্টশালী ৭২, ৭৩, ৮৫, ১০১
নায়ক ১১
নায়সিংহ ওঝা ১৪০, ১৪১
নিখিলনাথ রায় ৩৪, ৬৩, ১০৩
নীলমণি মুখোপাধ্যায় ৬২
নীহাররঞ্জন রায় ৯৫, ১০৭, ১০৯, ১১০, ১১[illegible] ১১৭, ১২২, ১২৪-২৭, ১৩০ ১৩২, ১৩৫-৩৮, ১৪১-৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৬০, ১৬৪, ১৮৫
নোট্স্ অন দি বেঙ্গল রিনায়সন্স্ ২০২
নৈষধচরিত ২২, ১৭৩
ন্যাশনাল লাইব্রেরি ১৬২, ১৭০, ১৯৯

পজিটিভ ব্যাকগ্রাউণ্ড অব হিন্দু সোসিওলজি ১৪২
পদ্মনাথ ভট্টাচার্য ৭৬
পপুলার লিটারেচার অব বেঙ্গল (বঙ্কিমচন্দ্র) ১৯৫
পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৩, ৬৪
পেজেন্ট্রি অব বেঙ্গল ১৭৭, ১৯৬
প্যারীচাঁদ মিত্র ১৯৯
প্রচার ১০৩
প্রত্নতত্ত্ববিভাগ ১০৩
প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস ২২, ২৩, ২৮, ৪৬, ৬২, ১১৫, ১১৬, ১৬৯, ১৭৩, ১৭৬, ১৮০, ১৯৮, ২০০
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৩৯, ৯৭
প্রমোদলাল পাল ৮২, ১০৫, ১১৬
প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী ৯৪, ৯৫, ১১৬
প্রাচীন সাহিত্য ৪
প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি ৫২

প্রেসিডেন্সি কলেজ ১৬৬, ১৭৪

ফেরিশ্‌তা ১৬৩, ১৭৬
ফেস্‌টিভেল্‌স্‌ অব দি হিন্দুজ ১৫৯
ফোক এলিমেণ্ট ইন হিন্দু কালচার ১৪২

বখ্‌তিয়ার খিলজি ১৭৯
বঙ্কিমচন্দ্র ২, ৫, ১২, ১৬, ১৮, ২১, ২২, ২৭-২৯, ৩১-৩৩, ৪০-৪৩, ৪৯, ৫৯, ৭০, ৭৮, ৮০, ৮৯, ৯০, ৯২, ৯৪, ৯৯, ১০৩, ১০৯, ১১০, ১১৫, ১১৬, ১২৩, ১২৪, ১৩২, ১৩৬, ১৩৮, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৬, ১৫৮, ১৬৭, ১৬৯, ১৭১, ১৭৩, ১৮০, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৮, ২০০, ২০১
বঙ্গ ৯
বঙ্গদর্শন ৬, ২২, ২৩, ২৯, ৩৫, ৩৮, ৪৯, ৫১, ৭০, ১০৯, ১৫৭, ১৬৯, ১৭৩, ১৯৬, ১৯৮, ২০০
বঙ্গদেশপুরাবৃত্ত ১৬৪-৬৬, ১৯৩
বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত ১৯৩
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৪২, ৪৫, ৫০, ৬৭, ১২২, ১৪০, ১৪৬, ২০১
বঙ্গভাষার ইতিহাস ৪২, ১৯৫
বঙ্গীয় ইতিহাসপরিষদ্‌ ৩৯, ১০২, ১০৫, ১৮৪
বঙ্গীয় বিজ্ঞানপরিষদ্‌ ১৮৫
বঙ্গীয় সামাজিক ইতিহাস ১৫৮
বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্‌ ৪৩, ৬৫, ৯৩, ১০৩, ১৮৪, ১৯৯, ২০১

বঙ্গেতিহাস ১৬৭, ১৯৪
বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার ২৯, ১৯৬
বন্দেমাতরম্‌ ৩১
বরেন্দ্র ৯
বরেন্দ্র-অনুসন্ধানসমিতি ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৮৩, ১০৪
বর্ণপরিচয় ১৮৪
বল্লালসেন ১৪১
বসন্তরঞ্জন রায় ৮৭
বাংলাদেশের ইতিহাস ৯৬, ১০২, ১৪৭, ১৮৪
বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস ৮৪
বাংলার ইতিহাস ১৬১, ১৭৩, ১৭৭
বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব ৪২, ১৬৮, ১৯৫
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা ৪২, ১৯৯
বাঙ্গালার ইতিহাস ৬, ২৯, ৩৩, ৪৬, ৪৭, ৫২, ৫৩, ৬৯, ৭৩, ৮১, ১০৯, ১২২, ১৬৫, ১৬৬-৭০, ১৮৪, ১৯৪, ২০১
‘বাঙ্গালার ইতিহাস’ ২৯, ১৭৩
বাঙ্গালার ইতিহাস, নবাবী আমল ১২২, ১৮৪
‘বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা’ ২২, ২৯, ১৭৪
‘বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ’ ২৯
‘বাঙ্গালার কলঙ্ক’ ২৯
বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত ৬৩
বাঙ্গালার ভূগোল ও ইতিহাস ১৯৮
বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য ১৯৩

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৯২, ৯৭, ১৪০
'বাঙ্গালির উৎপত্তি' ২৯, ২০০
'বাঙ্গালির বাহুবল' ২৯
বাঙ্গালী কোন্ পথে ১৫১
বাঙ্গালীর ইতিহাস ১০৭-০৯, ১১৩, ১১৫, ১১৬, ১১৮, ১৪৪, ১৪৭, ১৫১, ১৬০
বাড়তির পথে বাঙালী ২০২
বাদাল ২৬, ২৭, ১৯১
বার্টন, জে. এ. জি. ১৯৭
বার্গেট ১৮৮
বালক (পত্রিকা) ১৬, ২০
বিংশ শতাব্দীর বঙ্গসংস্কৃতি ২০২
বিগ্রহপালদেব ২৭, ১৯২
বিজয়চন্দ্র মজুমদার ৮৭
বিনয়কুমার সরকার ১৪২, ১৪৩, ২০১
বিনয়চন্দ্র সেন ৯০
বিনয়সরকারের বৈঠকে ১৪৩, ১৪৪, ২০২
বিবেকানন্দ ১৬, ১৮
বিশ্বপরিচয় ১৮৪
বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ১৮৪
বিশ্বভারতী পত্রিকা ১২১
বীজন ৫২, ১৬৯, ১৯৪
বৃহৎ বঙ্গ ৭৭, ১১৭, ১২২
বৃহদ্ধর্মপুরাণ ১৫৮
বেঙ্গল ১৯৬, ১৯৭
বেঙ্গল পাস্ট এ্যাণ্ড প্রেজেন্ট ৭০, ৭৪, ১০৪
বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশন ১৫৮, ১৯৫
বেঙ্গলি লিটারেচার ৪২, ৮৮, ৮৯, ৯৮, ১০০ ১১৫
বেণ্টিঙ্ক ৫২, ১৬১, ১৬৫, ১৬৯, ১৯৪
বেভারিজ ১৫৪
বৈষ্ণব সম্প্রদায় ১১
বোধোদয় ১৮৪
ব্যাকরণকৌমুদী ১৮৪
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৩, ২০২
ব্রিগ ১৬৩
ব্রিফ সার্ভে অব ইণ্ডিআ (মার্শম্যান) ১৬২
ব্রিফ হিস্টরি অব এন্‌সিএন্ট এ্যাণ্ড মডার্ন্ বেঙ্গল ১৭৮, ২০১
ব্লখম্যান ৬০, ১৫৪, ১৭৬, ১৯৬

ভল্‌টেআর ৩১
ভারতচন্দ্র ৪২, ১৯৫
ভারতমুক্তিসাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা ৯৭
ভারতী ৩৪-৩৭, ১০৩
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৫২, ১৬৮, ১৬৯, ১৭২, ১৮৪, ১৯৪
ভোজদেব ১১৭
ভ্যান্‌সিটার্ট ৬০, ১৯১

মডার্ন্ ওআর্লড্ ১৯৭
ময়নপাল ৬৬
মধুসূদন দত্ত ৯২

মধ্যযুগে বাঙলা ৭৩
মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী ৯৫
মনুসংহিতা ১১১
মনোরঞ্জন ইতিহাস ১৬৭
ময়নামতী-লিপি ১৯২
মহাবিদ্যালয় ১৬১
মহাভারত ১৩৯
মহীপাল, দ্বিতীয় ১৪১
মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৪২, ১৯৫
মার্শম্যান ২২, ৩৩, ৫২, ১৬১-৬৫, ১৬৭, ১৭৩, ১৭৪, ১৯৩, ১৯৪, ২০১
মিসেলেনিঅস এসেজ ১৫৮, ১৯৮
মিস্‌টেরিঅস ইউনিভর্স ১৮৩
মীরকাশিম ৬২
মুক্তির সন্ধানে ভারত ২০২
মুর্শিদাবাদকাহিনী ৩৪
মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ৩৪
মৃণালিনী ৩৩, ১৯৬
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ১৬৫
মেকলে ১৬১
মোনাহান, এফ. জে. ৭০, ৭৪, ১৫৪
মৌআট, এফ. জে. ১৯৪
ম্যাকডোনেল ৪-৬, ১১, ১৮৭, ১৮৮
ম্যাকসমূলার ১৫৬

যদুনাথ সরকার ৫২. ১০০-০২, ১০৫, ১১০
যশোহর-খুলনার ইতিহাস ৩
যোগেশচন্দ্র বাগল ২০২
যোগেশচন্দ্র রায় ৮৭

রঘুনন্দন ৯
রঘুনাথ শিরোমণি ১৭৩
রঘুবংশ ১৩৯
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৯২
রজনীকান্ত গুপ্ত ৩, ৪৬, ৪৭, ১৭০, ১৭২, ১৭৩, ১৮৪, ২০১
রজনীকান্ত চক্রবর্তী ৬৫, ৭২, ৮১
রণবঙ্কমল্লদেব ২৭, ১৯২
রবীন্দ্রজীবনী ৩৯, ৯৭
রবীন্দ্রনাথ ২, ৪, ১৫, ১৬, ২০, ৩৩-৩৫, ৩৭, ৩৯-৪১ ৪৩, ৪৫, ৪৬, ৫১, ৮৭. ১০০, ১০৩, ১১০, ১৪২, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৩, ১৭৪, ১৮৪
রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার ২, ১৫০
রমাপ্রসাদ চন্দ ৬৪, ৬৭, ৭০, ১১০, ১২২, ১৩৩
রমেশচন্দ্র দত্ত ৩, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৭, ৬৭, ৮৯, ৯০, ১৭৭, ১৮০, ১৮৪, ১৮৫, ১৯৬, ১৯৯, ২০১
রমেশচন্দ্র মজুমদার ৭৩, ৭৯, ৮২, ৯১, ৯৬, ৯৭, ১০২, ১০৫, ১০৯, ১১০, ১১৪, ১১৬, ১১৭, ১২৪, ১৪৭, ১৮৪-৮৫
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৪, ৬৮, ৬৯, ৭১০ ৭৩, ৮১, ৮২, ৯৬, ১০১, ১০৯, ১১০, ১২২, ১৮৪, ১৮৫

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ২১-২৩, ২৮, ৪৬, ৪৭
৪৯, ৫০, ৬২; ১১৫, ১২৪, ১৬৯, ১৭০,
১৭২, ১৭৩, ১৭৬, ১৮০, ১৮৪, ১৯৮,
২০০
রাজতরঙ্গিণী ৬৬, ১৩১
রাজনারায়ণ বসু ৪২, ১৯৯
রাজমালা ৩
রাজসিংহ ৩৩
রাজাবলি ১৬৫
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ২২, ২৮, ৬৬, ৬৯, ১১০,
১৫৫, ১৭৫
রাঢ় ৯
রাধাগোবিন্দ বসাক ৭৬, ১১৪, ১৫২
রামকমলসেন ১৯৩
রামগতি ন্যায়রত্ন ৪২, ৫২, ১৪০, ১৬৮, ১৬৯
১৭২, ১৮৪, ১৯৫, ১৯৬
রামগোপাল ঘোষ ১৬৫
রামচরিতম্ ৬৫, ৬৬, ৬৯, ৮২, ৮৩, ৯৪, ১৫২
রামতনু লাহিড়ী ৫৩, ৫৫, ১৬৫, ১৭৪
রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ
৫৩, ১৬৫, ১৭৪, ২০৩
রামতনু লাহিড়ী, হিস্টরি অব দি রিনায়সন্স্
অব বেঙ্গল ৫৫
রামপ্রসাদ সেন ৪২, ১৯৫
রামপ্রাণ গুপ্ত ৬২
রামমোহন ১২, ১৩, ১৮
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৯৭
রামায়ণ ১৩৯
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৮৭
রিজলি ১৫৭
রিয়াজ-উস-সলাতীন ৬০-৬২, ১৯২, ১৯৩
রুদ্রযামল তন্ত্র ১৫৮
রুশো ৩১
রোনাল্ড্‌শে, লর্ড ৭১

লক্ষ্মণসেন ১৪১
লঙ সাহেব ১৬৮
লঙ সাহেবের ক্যাটালগ ১৬৪, ১৬৭
লাইফ এ্যাণ্ড ওআর্ক অব রমেশচন্দ্র দত্ত ১৯৭
লাইফ এ্যাণ্ড টাইমস্ অব কেরী মার্শম্যান এ্যাণ্ড
ওআর্ড ১৬২
লালমোহন বিদ্যানিধি ১৫৫-৫৭, ১৯৮, ২০১
লিটারেচার অব বেঙ্গল ৪২, ৪৩, ৬৭, ৯০,
১৯৯, ২০১
লীলা রায় ৮৮, ১০০
লেথব্রিজ, রোপার ৫৫, ৫৬, ১৭৩-৭৬, ১৭৮,
১৯৬, ১৯৮, ২০১, ২০৩
লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা ১৮৪
লোকেন্দ্রনাথ পালিত ১৮১
ল্যাসেন, প্রোফেসর ১৭৫

শরৎকুমার রায় ৭, ৬৫
শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১২১

শচীচন্দ্র দত্ত ৪৪, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৯
শান্তাদেবী ১৭
শিক্ষাদর্পণ ৫৩, ১৯৪
শিবনাথ-জীবনী ৫৩
শিবনাথ শাস্ত্রী ৩, ৫৩, ৫৬, ১৭৪, ২০৩
শিবাজী ৯, ১০২
শিবাজী ও মারাঠা জাতি ৭
শ্রীকৃষ্ণ ১২

সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালার ইতিহাস ৬২
সংবাদপত্রে সেকালের কথা ৯৩, ৯৪, ১৬৭, ১৯৩
সংবাদপ্রভাকর ১৯৫
সংস্কৃত কলেজ ৬২
সংস্কৃতশিক্ষা ১৮৪
সতীশচন্দ্র মিত্র ৩
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ২০, ২১
সন্ধ্যাকরনন্দী ৬৫, ৮২, ১৫২
সপ্তগ্রাম ২২
সমাচারদর্পণ ১৫৫, ১৫৭, ১৯৮, ২০১
সরলা দেবী ৩৪
সলিমুল্লা ৬০, ১৯১, ১৯২
সহজ ইংরেজিশিক্ষা ১৮৪
সহজ পাঠ ১৮৪
সহজ রচনাশিক্ষা ১৮৪
সাধনা ৩৪, ১০৩, ১৮১
সাম হিস্টরিকাল এ্যাসপেক্টস্ অব দি ইনস্‌ক্রিপসনস্ অব বেঙ্গল ৯০
সাহিত্যসাধক-চরিতমালা ১, ৩২, ৯৩, ১৬৭, ১৬৮
সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস ৩
সিয়র-উল-মুতাখরিন্ ১৬৩, ১৯২
সিরাজদ্দৌলা ৩৪, ৩৫, ৩৯, ৪৬, ১৪৬, ১৮৪, ২০১
সীতারাম ৩৩
সুকুমার সেন ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৪, ৯৫, ১১৬, ১৪০, ১৯৩
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৮৭
সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৮৫
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬, ১৮
সূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায় ২০০
সোস্যাল হিস্টরি অব দি প্রিন্সিপাল হিন্দু কাস্‌ট্‌স ইন বেঙ্গল ১৫৬, ১৯৮
স্কুলবুক সোসাইটি ১৬১, ১৬৪, ১৯৩
স্কুল সোসাইটি ১৬১
স্টুআর্ট, চার্লস্ ২২, ২৫, ২৬, ৫৮-৬০, ৭১, ১০৯, ১২৭, ১৫৪, ১৬১, ১৬৩, ১৬৪, ১৭৩, ১৭৬, ১৭৯, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪
স্টেপল্‌টন ১৫৪

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৬৪-৬৬, ৭১, ৮২, ১১০
হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ৪২, ১৯৫
হর্ষচরিত ৩৬

হাজার বছরের পুরাণো বাঙলা ও বাঙালী
 ১২১
হাণ্টার ১৭৬
হ্যালহেড ২৬, ১৯১
হিন্দু কলেজ ১৬১
হিন্দু বেঙ্গল ১৯৯
হিরণ্ময়ী দেবী ৩৪
হিস্টরি অব আসাম ৭৬
হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া ১৬২
হিস্টরি অব দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গোএজ এ্যাণ্ড
 লিটারেচার ৬৬
হিস্টরি অব দি ব্রাহ্ম সমাজ ৩, ৫৬
হিস্টরি অব নর্থ-ইস্টারন্ ইণ্ডিয়া ৭৬
হিস্টরি অব বেঙ্গল ২৫, ৩৩, ৫২. ৫৮, ৬০, ৭
 ৯১, ৯৬, ১০০, ১০২. ১০৯, ১১৬,
 ১৩৭, ১৬১, ১৬৩, ১৬৭, ১৯২, ১৯৩
হিস্টরি অব সিভিলাইজেশন ইন এন্সিএণ্ট
 ইণ্ডিয়া ৩
হীরানন্দ শাস্ত্রী ৭৯, ১১৭
হুগলী কলেজ ৩৩, ১৬৭, ১৯৪
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬
হেমচন্দ্র রায় ৭৫
হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ১১৪
হেমলতা দেবী ৫৬
হেস্টিংস, ওআরেন ২৪
হ্যালিডে, সার ফ্রেডারিক ১৭৫